ইতিহাসে নেই

(ছেলেমেয়েদের গল্প)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দাম ঃ আট আনা

প্রকাশক

শ্রীরাধারমণ দাস

ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস

৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক চিত্রিত

প্রিণ্টার

শ্রীরাধারমণ দাস

ফাইন আর্ট প্রেস

৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
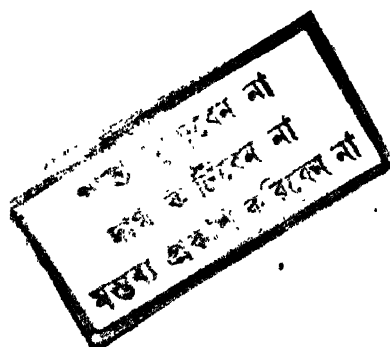
অনেক ছেলে দেখেছি—

তাদের মধ্যে

নরম-উদার মনে

সহজ প্রীতি-হাসিতে

মন-গলানো মিষ্ট স্বভাবে

সেরা-ছেলে

শ্রীমান্ দিলীপকুমার দত্তগুপ্ত

কল্যাণীয়-কুমার-কর-কমলেষু

২, এলগিন লেন
কলিকাতা, ১৫ বৈশাখ, ১৩৪৮

শুভা
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
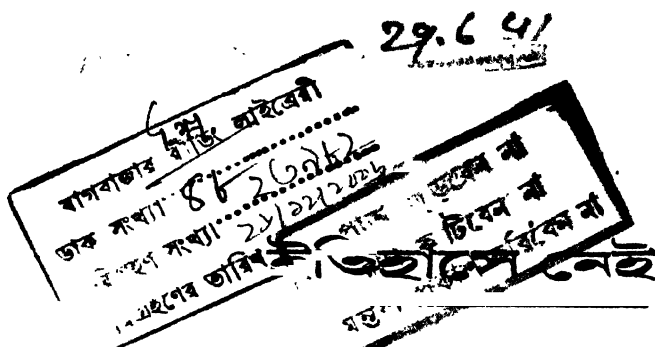
হাজার বছর আগেকার কথা। পুরাণে বা পুঁথি-পত্রে এ-কথা লেখা নেই। বহু কষ্টে আমরা এ-কাহিনী সংগ্রহ করেছি।

পাড়া-গাঁ। সেই গাঁয়ে বাস করে এক গরীব ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের আছে এক ব্রাহ্মণী।

সংসারে চারিদিকে অভাব! পয়সা নেই, অন্ন নেই, বস্ত্র নেই; তার উপর ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর সন্তান নেই!

ব্রাহ্মণী একদিন ব্রাহ্মণকে ডেকে বললে—তুমি আর একটি বিয়ে করো। সে বৌয়ের ছেলে হবে। সেই ছেলে বড় হয়ে চাকরি করবে, দারিদ্র্য ঘুচবে।

ব্রাহ্মণ আর-একটি বিবাহ করলে। নতুন ব্রাহ্মণী এলো। দুঃখ আরো বাড়লো। সকলেই চুপ করে সে-দুঃখ সয়। ভাবে, নতুন ব্রাহ্মণীর ছেলে হবে। সে-ছেলে বড় হবে; হয়ে চাকরি-বাকরি করবে, তখন দুঃখ-দারিদ্র্য ঘুচবে। ভাবনা কি?

এক বছর কাটলো। দু' বছর কাটলো। নতুন ব্রাহ্মণীর ছেলে হবে। নতুন ব্রাহ্মণীকে তার বাপের বাড়ী পাঠানো হলো।

ছেলে হলে এ-বাড়ীতে কে দেখবে? সেখানে তবু লোকজন আছে, তারা দেখাশুনা করবে।

দিন যায়, মাস যায়। ব্রাহ্মণ বলে—ব্রাহ্মণী!

ব্রাহ্মণী বলে,—কেন?

ব্রাহ্মণ বলে—একবার শ্বশুর-বাড়ী যাই। তত্ত্ব নি।

ব্রাহ্মণীর মনে জাগলো হিংসে। কিন্তু সে-ভাব গোপন করে' ব্রাহ্মণী বললে,—বেশ। পিঠে তৈরী করে দি। নিয়ে যেয়ো। কুটুম-বাড়ীতে শুধু-হাতে যেতে নেই। কাল সকালে তুমি বেরিয়ো।

—বেশ কথা।

সারা রাত জেগে ব্রাহ্মণী পিঠে তৈরী করলো—গুণে একশো কুড়িখানি। একশোখানি পিঠে একটা হাঁড়িতে ভরে' সে-হাঁড়ির মুখে সরা এঁটে দিয়ে ব্রাহ্মণী বললে,—এগুলোয় খবর্দ্দার হাত দিয়ো না। এগুলো সেখানে দিয়ো। তত্ত্ব। আর এই বিশখানি পিঠে আলাদা দিলুম পিতলের কাঁশিতে—কাঁশি থেকে পিঠে নিয়ে পথে খেয়ো, বুঝলে।

ব্রাহ্মণ বললে,—বুঝেচি।

হাঁড়ি আর কাঁশি নিয়ে ব্রাহ্মণ সকালে যাত্রা করলো।

ব্রাহ্মণী নিশ্বাস ফেললে। ভাবলে, এবার বাঁচা যাবে।

অর্থাৎ যে একশো পিঠে হাঁড়িতে ভরে' দিয়েছে, ব্রাহ্মণী তাতে বিষ মিশিয়েছে। এ-পিঠে খেয়ে নতুন ব্রাহ্মণী আর তার মা-বাপ মারা যাবে; নতুন ব্রাহ্মণীর ছেলেটিকে. তখন নিজের ছেলের মতো সে নিজে মানুষ করবে! সে-ছেলে বড় হয়ে রোজগার করলে ব্রাহ্মণীর আর দুঃখ থাকবে না।

বিষের কথা ব্রাহ্মণ জানে না। পিঠে নিয়ে সে চললো শ্বশুর-বাড়ী।

অনেক পথ। ফুরোতে চায় না! ব্রাহ্মণ চলেছে, চলেছে। সন্ধ্যার আগে এলো এক ঘন বনে। এই বনের পরে শ্বশুরের গাঁ।

যেমন ক্ষিদে, তেমনি পিপাসা! ব্রাহ্মণের নাড়ী জ্বলছে! রাত্রে এ বন পার হওয়া সম্ভব নয়। বাঘ-ভাল্লুক আছে, সাপখোপ আছে, চোর-ডাকাত আছে! যদি কোনো বিপদ ঘটে?

বনে পুকুরের ধারে বসে ব্রাহ্মণ বিশখানি পিঠে খেয়ে শেষ করলে; তারপর আঁজ্‌লা ভরে খেলে পুকুরের জল……

সূর্য্য অস্ত গেল। সামনে আঁধার-ঘেরা বন। ব্রাহ্মণ পিঠের কাঁশিখানি মেজে-ঘষে হাঁড়ির মুখে রেখে ঝোপের পাশে পড়ে চোখ বুজলো।

বনের অন্যদিকে আর-এক রাজার রাজ্য। তাঁর মেয়ে ডাগর

হয়েছে। মেয়ের জন্য রাজা যোগ্য পাত্র খুঁজে পাচ্ছেন না; কাজেই মেয়ের বিবাহ হচ্ছে না।

দেশে রাজপুত্রের অভাব? তা নয়। রাজপুত্র-জামাই রাজা চান না! তিনি চান, বীর-জামাই। তাঁর একটিমাত্র মেয়ে! রাজা চোখ বুজলে রাজ্য রক্ষা করতে পারে, এমন বীর-জামাইয়ের তিনি সন্ধান করছিলেন। তেমন পাত্রের কথা কোনো ঘটক আনতে পারে না! কাজেই দুশ্চিন্তায় রাজার দিন কাটে।

ভবিতব্য! সেদিন রাত দুপুরে রাজার বাড়ীতে ডাকাত পড়লো। একশো ডাকাত। ঘুমন্ত রাজকন্যাকে এমন কৌশলে তারা চুরি করে নিয়ে এলো যে, দেউড়ীর প্রহরী কি, রাজকন্যাও তা জানতে পারলেন না!

রাজকন্যাকে নিয়ে ডাকাতের দল এলো সেই ঝোপের পাশে—যে-ঝোপের কাছে ব্রাহ্মণ নিদ্রায় মগ্ন!

রাজকন্যাকে একপাশে শুইয়ে দিয়ে সর্দ্দার বললে,—খাবারের চেষ্টা ছাখো। এত রাত্রে সহরের দোকান বন্ধ—খাবার মেলে না! এ তো বিজন বন!

হঠাৎ চোখ পড়লো হাঁড়িতে। হাঁড়ি খুলে ডাকাতের দল দেখে, পিঠের রাশ। গুণে দেখে, বাঃ, ঠিক একশোখানি! যেন তাদের জন্যই তৈরী!

এই পিঠেগুলোয় ছিল বিষ! খাবামাত্র একশো ডাকাত মাটীতে ঢুলে পড়লো—একেবারে কাল-নিদ্রা!

নিঃশব্দে এত-বড় কাণ্ড ঘটে গেল।

ভোরে ব্রাহ্মণের ঘুম ভাঙ্গলো। জেগে বসে ব্রাহ্মণ দেখে, পিঠের হাঁড়ি খালি আর পাশাপাশি পড়ে ঘুমোচ্ছে একশো লোক! তাদের কোমরে হাতিয়ার গোঁজা!

ব্রাহ্মণ বুঝলো, পিঠের হাঁড়ি এরাই খালি করেছে! পাজীর-পাঝাড়া! রাগে তাদের কোমর থেকে তলোয়ার খুলে ব্রাহ্মণ এক-এক কোপে একশো ডাকাতের গলা কাটলো। কেটে দেখে, সুন্দরী রাজকন্যা পাশে ঘুমোচ্ছেন—তাঁর মাথায় হীরের মটুক, গলায় মুক্তোর মালা। ব্রাহ্মণের ডাকাডাকিতে রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গলো।

রাজকন্যা বললেন—আমি কোথায়?

ব্রাহ্মণ বললে—বনে। ডাকাতরা তোমাকে চুরি করে এনেছিল।

ডাকাত? রাজকন্যা শিউরে উঠলেন।

হেসে ব্রাহ্মণ বললে,—ভয় নেই। আমি ডাকাত নই। ডাকাতদের আমি একেবারে কচু-কাটা করে মেরে ফেলেছি। ঐ ছাখো।

তাই তো! রাজকন্যা অবাক! এত-বড় বীর! রাজকন্যা পরিচয় দিলেন; ব্রাহ্মণকে বললেন—আমার বাবার রাজ্যে আমাকে পৌঁছে দিন। পথ চিনে আমি ফিরতে পারবো না।

নতুন ব্রাহ্মণীর জন্য ব্রাহ্মণের মন-কেমন করছিল খুবই। কিন্তু বেচারী রাজকন্যা! ব্রাহ্মণ বললে—বেশ, চলুন।

বেশী দূর যেতে হলো না। একশো ডাকাতের পায়ের চিহ্ন দেখে দু'শো ঘোড়সওয়ার নিয়ে সেনাপতি আসছিলেন রাজকন্যার সন্ধানে। পথে সব দেখা।

ব্রাহ্মণকে রাজকন্যা বললেন—আসুন, বাবার সঙ্গে দেখা না করে আপনি চলে যাবেন না।

ব্রাহ্মণ বললে,—কিন্তু আমার কাজ আছে।

রাজকন্যা বললেন,—দেরী হবে না। আপনাকে গাড়ী করে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা বাবা করবেন।

ব্রাহ্মণ বললে,—চলুন।

কন্যার শোকে রাজা অচেতন ছিলেন। সেই কন্যা ফিরে এসেছে! রাজার আনন্দ ধরে না!

রাজকন্যা বললেন,—একশো ডাকাতকে কেটে এই বীর-পুরুষ আমাকে উদ্ধার করেছেন।

সকলে অবাক! একশো ডাকাতকে একা কেটেছে! বাপ্‌রে বাপ্, এত-বড় বীর এযুগে জন্মায়!

রাজা বললেন—এ কথা সত্য?

ব্রাহ্মণ বললে—সত্য ভিন্ন আমি মিথ্যা বলি না, মহারাজ।

সেনাপতিকে নিয়ে রাজা বেরুলেন ঘোড়ায় চড়ে............

গিয়ে যা দেখলেন, গায়ে কাঁটা দিলে! একশো মুণ্ডু মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে!

রাজা বললেন—আমার পণ ছিল, বীরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেবো। এতদিনে বীরের দেখা পেলুম! মন্ত্রী, ঘোষণা করো, রাজকন্যার বিবাহ হবে এই বীর-ব্রাহ্মণের সঙ্গে।

ব্রাহ্মণের মনে পড়লো নতুন ব্রাহ্মণীর কথা! ব্রাহ্মণ বললে—কিন্তু আমি একটা কাজে বেরিয়েছিলুম, মহারাজ!

রাজা বললেন,—কুছ পরোয়া নেই! রাজার জামাই হচ্ছো—তোমাকে আর কাজ করতে হবে না। কি বলো মন্ত্রী?

মন্ত্রী বললেন,—নিশ্চয়।

মহা-সমারোহে বিবাহ হয়ে গেল।······আদরের ঘটায় নতুন ব্রাহ্মণীর কথা ব্রাহ্মণ ভুলে গেল।

মাসখানেক কাটলো। ওদিককার কোন্ মুল্লুক থেকে প্রজারা এসে কেঁদে জানালো,—মহারাজ, একটা তুরন্ত সিংহ ভয়ঙ্কর অত্যাচার সুরু করেছে।

রাজা বললেন,—কি ব্যাপার, শুনি।

তারা বললে, সিংহের উৎপাত এক-বৎসর পূর্ব্বে ভয়ঙ্কর বেড়ে ওঠে। শেষে মোড়লের সঙ্গে সিংহের সর্ত্ত হয়, পনেরো দিন অন্তর

একজন করে প্রজা পাঠানো হবে পূর্ণিমার রাত্রে; সিংহ তাকে আহার করবে। সে-সর্তের ফলে এক বৎসরে কত জোয়ান যে সিংহের পেটে গেছে… ..

প্রজারা কাঁদতে লাগলো। কেঁদে বললে, তারা আর পারে না।

রাজা বললেন, কি উপায়, মন্ত্রী?

মন্ত্রী বললেন,—তাইতো!

রাজা চিন্তিত হলেন। জামাই-ব্রাহ্মণের হৃৎকম্প!

প্রজারা বললে—আপনার এমন বীর-জামাই! একশো ডাকাতের মুণ্ডু কেটেছেন একা……এ তো একটামাত্র সিংহ! তাঁকে যদি সিংহ-নিপাতের জন্য পাঠান্ মহারাজ, তবেই বাঁচি। নাহলে অন্য রাজ্যে গিয়ে আমাদের বাস করতে হবে।

রাজা বললেন—জামাই-রাজা নিশ্চয় তোমাদের রক্ষা করবেন!

নিরুপায়! ব্রাহ্মণ বললে,—সিংহ! এ তো ডাকাত নয়, মহারাজ। এতে কৌশল চাই।

—কি কৌশল?

ব্রাহ্মণ বললে,—যত রকম অস্ত্র আপনার অস্ত্রাগারে আছে, সেই সব অস্ত্র আমার সঙ্গে দিন। দিয়ে আমাকে সে-বনের খুব উঁচু একটা গাছের ডালে বেশ করে বেঁধে রাখতে হবে। তার পর……

রাজা বললেন,—বেশ!

তাই হলো। মহাবনে প্রকাণ্ড উঁচু বটগাছ। তার মগ-ডালে ব্রাহ্মণকে বেঁধে সকলে বন ছেড়ে রাজ্যে ফিরে এলো। ব্রাহ্মণের দু হাতে তলোয়ার, শড়্কী, বর্শা, তীর অর্থাৎ অস্ত্রের গোছা······ হাতে যত ধরে!

রাত প্রায় বারোটা। গাছের তলায় সিংহের গর্জ্জন! সিংহের সে-মূর্ত্তি দেখে ব্রাহ্মণের প্রাণ উড়ে যাবার জো! হাত কাঁপলো···অমনি সঙ্গে সঙ্গে হাতে-ধরা অস্ত্রগুলি হাত থেকে খশে পড়লো······

ভবিতব্য! রাজ-ভোগে জামাইয়ের দেহ নধর! সিংহ হাঁ করে ব্রাহ্মণকে দেখছিল—ঠিক সেই সময় হাত থেকে খশে শড়্কীটা এসে পড়লো একেবারে সিংহের টাগ্‌রায়! সিংহের মুখে আর 'রা' শব্দ বার হলো না—প্রচণ্ড চীৎকার করে সিংহ প্রাণ হারালো!

ব্রাহ্মণ জানতে পারলো না, কি হয়েছে। তার জ্ঞান নেই, চেতনা নেই! স্বপ্ন দেখছিল, সিংহের দাঁতের উপর দিয়ে সোজা সে চলেছে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার সিংহের পেটের মধ্যে।

সকালে ঘুম ভাঙ্গলো। চোখ খুলতে ব্রাহ্মণের সাহস হয় না! চোখ খুললেই হয়তো দেখবে, সিংহের পেটের মধ্যে বসে আছে।

সিংহ হাঁ করে' ব্রাহ্মণকে দেখছিল

এমন সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দ! ভয়ে ভয়ে ব্রাহ্মণ চোখ চাইলো। চেয়ে দেখে, নীচে......চমৎকার!

ঘোড়ায় চড়ে সৈন্যরা এলো। বাঁধন খুলে ব্রাহ্মণকে গাছ থেকে নামানো হলো।

ব্রাহ্মণ বললে,—দেখেছো হাতের তাগ! শড়্‌কীটা বিঁধেছে গিয়ে একেবারে সিঙ্গীর টাগ্‌রায়···একোঁড় ওফোঁড়!

সকলে বললে—এত অস্ত্র?

ব্রাহ্মণ বললে—জানো না? সিঙ্গী মারা গেলে তার প্রজারা···মানে, বনের যত পশু এসে উৎপাত সুরু করেছিল। আমার অস্ত্র-বর্ষণে চোট্ খেয়ে তারা বন ছেড়ে পালিয়েছে!····· সাধে বলেছিলুম, গাছে আমাকে বেঁধে রেখে যাও! হুঁঃ! মানে, যুদ্ধ শেষ করে ঘুমোতে হবে তো! ঘুমের ঘোরে শেষে ডাল থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙ্গি আর কি! তাই এ বাঁধন।

সকলে জয়-ধ্বনি তুলে ব্রাহ্মণকে নিয়ে রাজ্যে ফিরলো।

রাজ্যে উৎসবের ঘটা পড়লো। উৎসবের শেষে ব্রাহ্মণ এক চিঠি পেলে। ব্রাহ্মণী চিঠি লিখেছে! এতদিন বাড়ী-ছাড়া—ভাবনায় ব্রাহ্মণী কত সন্ধান করে খপর পেয়েছে, ব্রাহ্মণ আছে এখানকার রাজপুরীতে! ব্রাহ্মণী লিখেছে,—

তুমি রাজভোগ খাচ্ছ! আমার কথা বুঝি মনে পড়ে না?

ব্রাহ্মণ গিয়ে রাজাকে বললে,—মহারাজ, আমি দেশে যেতে চাই।

রাজকন্যা বললেন—আমিও যাবো স্বামীর সঙ্গে......স্বামীর ভিটে চোখে দেখবো না ?

রাজা বললেন—আমাদের যে মন-কেমন করবে।

রাণীর চোখে জল এলো। রাণী বললেন,—কেন যাচ্ছো বাবা ? সে ভিটে যাক গে······

ব্রাহ্মণ বললে—আমার ব্রাহ্মণী আছেন কি না···তাঁকে কোনো খপর না দিয়ে এখানে বাস করছি······

রাণী বললেন,—বেশ, ঠিকানা দাও, আমি পাল্কী পাঠাচ্ছি তোমার ব্রাহ্মণীকে আনতে।

ব্রাহ্মণ বললে—আরো একটি ছোট ব্রাহ্মণী আছে। সে আছে আমার শ্বশুর-বাড়ীতে। ভিন্ন গ্রামে।

রাজা বললেন—বেশ, তাঁর ওখানেও পাল্কী পাঠাচ্ছি ! রাজবাড়ীতে পাল্কীর অভাব আছে বাপু !

ব্রাহ্মণ বললে,—কিন্তু···

রাজকন্যা বললেন—কিন্তু কিসের ! ভাবচো, এর পরে যখন রাজা হবে, তখন তিনজন রাণী হবে ! তাতে কি ? রাজা দশরথের ছিলেন তিন রাণী···কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রা। তেমনি আমরাও তোমার তিন রাণী হবো।

ব্রাহ্মণ বললে—তাহলে পাল্কী পাঠান, মহারাজ! আমি শুধু দুই ব্রাহ্মণীর নামে চিঠি লিখে দি। তাঁরা পাল্‌কী চড়ে এখানে আসবেন।

তাই হলো। দুদিক থেকে দুই ব্রাহ্মণী এলো। এবং···

তারপর রাজা একদিন মারা গেলেন। রাজার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ হলো রাজা। পাশে তিন রাণী—দুই ব্রাহ্মণী আর এক রাজকন্যা।

তিনজনে কোনোদিন কলহ-বিবাদ হয়নি। তাই বোধহয়, ব্রাহ্মণ-রাজার এ-কাহিনী নিয়ে আজ-পর্য্যন্ত কেউ লেখে নি কোনো ইতিহাস, কিম্বা রামায়ণের মতো কোনো মহাকাব্য!

লক্ষ্মী-প্যাঁচা

এক রাজা আর তাঁর মন্ত্রী।

রাজার বয়স বেশী নয়। বছর-খানেক হলো পুরোণো রাজা মারা গেছেন। ইনি তাঁর ছেলে; রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেছেন। মন্ত্রীর বয়স হয়েছে। সাবেক মন্ত্রী।

সকালে রাজা রাজ-সভায় বসেছেন। পাত্রমিত্র, অমাত্যবর্গ রাজ্যের খপর শোনাচ্ছেন, এমন সময় মন্ত্রী এলেন। তাঁর মুখ মলিন।

মন্ত্রীর বিরস মুখ দেখে রাজা চমকে উঠলেন, ডাকলেন, —মন্ত্রী-মশায়···

নিশ্বাস ফেলে মন্ত্রী বললেন,—মহারাজ···

রাজা বললেন,—আপনাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখছি!

মন্ত্রী বললেন—হ্যাঁ মহারাজ! ঘরে যা-কিছু পয়সা-কড়ি নিয়ে যাই, গৃহিণী দরাজ হাতে তা খরচ করেন। এই দেখুন না মহারাজ, মাসের আজ ষোল তারিখ—পয়লা তারিখে রাজকোষ থেকে মাইনে নিয়ে গেছি! ছেলে-মেয়েদের খাওয়া-দাওয়ায়, খেলনা-পুতুলে, জামা-কাপড়ে আর নিজের গহনা গড়িয়ে গৃহিণী তার সব খরচ করে ফেলেছেন। এখন মাসের এতগুলো দিন বাকী···কি করে আমি চালাবো, তাই মহা ভাবনা হয়েছে।

রাজা বললেন—হুঁ! তা তার জন্য এত ভাবনা কেন? আপনি বাবার আমোল থেকে মন্ত্রিত্ব করছেন, আপনার দায়ে আমার দেখা কর্ত্তব্য। যা দরকার, খাতাঞ্জি-মশায়ের কাছ থেকে নিয়ে যাবেন'খন।

মন্ত্রীর দুশ্চিন্তা কাটলো। তিনি খুশী হলেন।

এর পরেই প্রহরী এসে খপর দিলে, রাজপুরীর বাইরে পথে এক পশারী এসেছে, তার বাজরায় নানা রকমের জিনিষ। মহারাজের কাছে সে জিনিষ বেচতে চায়।

রাজা বললেন—তাকে নিয়ে এসো। ব্যবসায়ী-লোককে সাহায্য করা রাজার কর্ত্তব্য! আমি তার জিনিষ কিনবো।

নানা রকমের পশরা নিয়ে পশারী এলো। হাল ফ্যাশানের বিস্তর সব গহনা, কাঁচের চুড়ি, বাসন, পুতুল, হাতীর দাঁতের খেলনা—আরো কত কি! রাজা অনেক জিনিষপত্র কিনলেন। কিনে পাত্রকে দিলেন; মিত্রকে দিলেন; অমাত্যদের দিলেন; দিয়ে খাতাঞ্জিকে বললেন—ফর্দ্দ মিলিয়ে দামগুলো একে দিয়ে দিন, খাতাঞ্জি-মশায়।

সোনা-বাঁধানো একখানি মাথার চিরুণী নিয়ে মন্ত্রী-মশায় উল্টে-পাল্টে দেখছিলেন। রাজা তা দেখলেন। দেখে বললেন—ওখানি পছন্দ হয় যদি, বেশ, নিন, মন্ত্রিণী-ঠাকুরুণকে দেবেন।

মন্ত্রী অপ্রতিভ হলেন। বললেন—না, না মহারাজ। মন্ত্রিণী-ঠাকুরুণের আর চিরুণী মাথায় দেবার বয়স নেই। তাঁর মাথার চুল কতক গেছে পেকে, কতক গেছে উঠে।

এ চিরুণী মাথার কোথায় তিনি গুঁজবেন ? আর কি তাঁর সে খোঁপা আছে, মহারাজ ?

রাজা বললেন—তা হোক, ওখানি নিন। বলবেন, খোকা-রাজা কিনে দেছে।

মন্ত্রী বললেন—আপনার দান তিনি মাথায় তুলে নেবেন।

মন্ত্রীকে সে-চিরুণী নিতে হলো।

পশারী খুশী-মনে বাজরায় পশরা গুছিয়ে তুলছিল। রাজা দেখলেন, বাজরার উপরে হাতীর দাঁতের তৈরী লম্বা একটা বাক্স। এ জিনিষটা তো দেখা হয়নি ! তিনি বললেন—দেখি, দেখি, ও-বাক্সে কি আছে।

পশারী বললে—এ এক ভারী আশ্চয্যি বাক্স, মহারাজ। কাশীর এক সন্ন্যাসী আমাকে দিয়েছিলেন। এ বাক্সে আছে ছোট একটি কৌটো ; আর তালপাতায় লেখা ছোট একখানি পুঁথি।

—বটে ! বটে ! দেখি তোমার সে কৌটো আর পুঁথি।

রাজার হাতে পশারী হাতীর দাঁতের বাক্স তুলে দিলে। বাক্স খুলে রাজা দেখেন, পশারীর কথা সত্যি। বাক্সে আছে ছোট একটি কৌটো তাতে গুঁড়ো-নস্যি। আর পুঁথিখানা ?

তাই তো ! অক্ষর চেনেন না। রাজা পড়তে পারলেন না। মন্ত্রীর হাতে পুঁথি দিয়ে রাজা বললেন,—সংস্কৃতর লেখা। দেখুন তো মন্ত্রী-মশায়।

পুঁথি নেড়ে-চেড়ে মন্ত্রী-মশায় তার অক্ষর বোধগম্য করতে পারলেন না। বললেন—ছেলেবেলায় পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত

পড়েছিলুম, মহারাজ কিন্তু সে তো এ রকম অক্ষর নয়। সে সংস্কৃত বোঝা যেতো। এ সংস্কৃত···না, বোঝবার জো নেই!

সভায় কেউ সে অক্ষর বুঝতে পারলেন না। তখন টোল থেকে সভা-পণ্ডিতের ডাক পড়লো।

সভা-পণ্ডিত এলেন। রাজা বললেন—পুঁথির এ লেখা পড়ে দিন সার্ব্বভৌম-মশায়।

নাকে বিশবার নস্যি গুঁজে পঞ্চাশটা হাঁচি হেঁচে কোনোমতে সভা-পণ্ডিত সার্ব্বভৌম-মশায় পুঁথির পাঠোদ্ধার করলেন। বললেন,—এ হলো পালি-ভাষা, মহারাজ। এতে লেখা আছে, কৌটোতে যে-নস্যি আছে, সে-নস্যি নাকে দিয়ে মানুষ যদি কামনা করে যে-কোনো রকমের পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ হতে, তাহলে সে তা পারবে। মানে, সিন্ধু-ঘোটক, গয়-গবাক্ষ, বাঘ-ভাল্লুক থেকে আরম্ভ করে হাঁস-চিল, ময়ূর-কাক,—মায় টিকটিকি গিরগিটি বিছে ছুঁচো উচ্চিংড়ে গঙ্গাফড়িং পর্য্যন্ত! আর সেই-রূপ ধরে সকল পশু-পক্ষীর ভাষা সে বুঝতে পারবে। কিন্তু সাবধান, পশুপক্ষীর দেহ ধারণ করে থাকবার সময় কখ্‌খনো যেন হাসবেন না—মরে গেলেও নয়! হাসলেই অনর্থ ঘটবে। অর্থাৎ হাসলে ফিরে-ফিরতি মানুষ হবার যে মন্তর, সঙ্গে-সঙ্গে সে মন্তরটি যাবে ভুলে।

রাজা বললেন—বাঃ, এ তো ভারী মজার নস্যি!

মন্ত্রী বললেন—হ্যাঁ।···আচ্ছা, তারপর আবার যদি সে মানুষ হতে চায়, তার মন্তর?

নাকে আবার ছু তিন টিপ নস্যি গুঁজে সার্ব্বভৌম মশায় বললেন,—একটি মন্তর লেখা আছে। মনে-মনে সেই মন্তর উচ্চারণ করলেই আবার যে-মানুষ সেই মানুষ হবে।

এ-কথা শুনে রাজার মন নেচে উঠলো! রাজা বললেন—এ বাক্সটি আমি কিনবো, পশারী। কত দাম নেবে, বলো।

পশারী বললে,—আজ্ঞে মহারাজ, এটি তো আমি বেচবো না।

রাজা বললেন—কেন বেচবে না?

মন্ত্রী বললেন—দাঁও কষ্‌ছো বাপু! রাজার মর্জ্জি হয়েছে বলে ভেবেচো, কেল্লা মেরে দেবে? তা হচ্ছে না! যদি না ব্যাচো, তাহলে আমরা এটি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত করবো, বুঝলে!

এ-কথা শুনে পশারী ভড়কে গেল। বললে,—তাহলে আপনি মহারাজ হচ্ছেন, আপনি নিন। নিয়ে দিন আমাকে এর দাম দশ-হাজার মোহর।

খাতাঞ্চিকে ডেকে রাজা বললেন—একে দশ হাজার মোহর দিন···এ বাক্সের দাম।

দাম নিয়ে পশারী চলে গেল।

তার পর রাজা সকলকে বললেন—আজকের মতো সভা

ভঙ্গ হোক। আপনারা এখন বাড়ী যান। মন্ত্রী-মশায়ের সঙ্গে আমার গূঢ় রকমের একটা পরামর্শ আছে।

সকাল-সকাল ছুটী হতে অমাত্য-পাত্রমিত্রেরা সকলে খুশী হয়ে যে যার বাড়ী চলে গেলেন। তখন রাজা বললেন,—আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে, মন্ত্রী-মশায়।

মন্ত্রী বললেন—কি মতলব, মহারাজ?

রাজা বললেন—আসুন, রাজ্যের বাইরে কোথাও গিয়ে এ নস্যি নাকে দিয়ে আমরা এক-জাতের পাখী হই। পাখী হয়ে উড়ে আকাশে বেশ খানিকটা চক্কর দিয়ে আসবো।

নিশ্বাস ফেলে মন্ত্রী বললেন—মন্ত্রিণীর যে-রকম মেজাজ হয়েছে আজকাল···সত্যি মহারাজ, এক একবার আমার উড়তে সাধ হয়। কিন্তু ওড়া-বিদ্যে তো শিখিনি কখনো। শেষে সাঁতার-না-জানা-মানুষ সাঁতার কাটতে গিয়ে যেমন ডুবে মরে, যদি তেমন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে?

রাজা বললেন—তা কেন হবে? যদি পাখী হই, তাহলে সেই সঙ্গে পাখীর ওড়বার শক্তি-সামর্থ্যও তো পাবো···

মন্ত্রী বললেন—পাবো তো বললেন, মহারাজ! কিন্তু বিশ্বাস কি? যদি না পাই? তখন?

রাজা বললেন,—তা কখনো হতে পারে? না, না, মন্ত্রী-মশায়, আপনি আপত্তি করবেন না। আসুন, খাওয়া-দাওয়া সেরে

দুজনে বেরিয়ে পড়ি। রাজধানী ছেড়ে অনেক দূরে গিয়ে কোনো খোলা মাঠে এ-নস্যির গুণাগুণ পরীক্ষা করা হবে।

মন্ত্রী-মশায় বললেন—পাখী যেন হলুম মহারাজ, তারপর আবার যখন আপনি মহারাজ আর আমি মন্ত্রী-মশায় হতে চাইবো ?

রাজা বললেন—কেন ? তার মন্তর তো পুঁথিতে লেখা আছে। মনে-মনে সেই মন্তর বললেই আবার যে-মানুষ সেই মানুষ হবো।

মন্ত্রী বললেন—কিন্তু সে মন্তর তো আমরা জানি না।

রাজা বললেন,—ঠিক ! সভাপণ্ডিত-মশায়কে ডাকিয়ে বাঙলা অক্ষরে সে মন্তর লিখিয়ে নি। নিয়ে দুজনে বেশ করে মুখস্থ করি। তাহলে তো আর গোল হবে না।

মাথা চুলকে মন্ত্রী বললেন,—কি জানি মহারাজ, আমার কেমন ভালো বোধ হচ্ছে না ! আছি মানুষ···বেশ আছি। হঠাৎ মানুষের শরীর ছেড়ে পাখী হওয়া···ধাতে যদি সহ্য না হয় ? তার ওপর উড়তে শিখিনি কোনোদিন···চিরদিন মাটীতে হেঁটে বেড়িয়েছি······

রাজা বললেন—না, না, মন্ত্রী-মশায়, আপনার বয়স হয়েছে বলে এত ভয় করছেন ! কিন্তু আমি বলছি, কোনো ভয় নেই। সভাপণ্ডিতকে ডাকান। মন্তরটা লিখে নিয়ে মুখস্থ করা যাক।

সভাপণ্ডিত মশায় এলেন; এসে বাঙলা অক্ষরে মন্তর লিখে দিলেন। মন্তরটি ছোট। সে মন্তর,

ওম্ হোম্ ফুট্-ফট্ ছট্!

মনুষ্য-দেহং পুনর্ঘট্!

মন্ত্রী বললেন,—দেখবেন পণ্ডিত-মশায়, অনুস্বার-বিসর্গগুলোয় যেন ভুল না হয়। এ সব হলো ভয়ঙ্কর মন্তর! ঠাকুর-পূজোর মন্তর নয় যে "লম্বোদর-সুত"কে 'লম্বা-করো-সুতো' বলে চালিয়ে দেবেন! বুঝলেন?

সভাপণ্ডিত বললেন—না, না, ভুল হবে কেন? এই অনুস্বার-বিসর্গ নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি। হুঁঃ, আমার হবে অনুস্বার-বিসর্গে ভুল?

মন্তর বলে' সভাপণ্ডিত চলে গেলেন। রাজা আর মন্ত্রী দুজনে বসে সে-মন্তর মুখস্থ করলেন। তারপর দুজনে দুজনের কাছে মুখস্থ-বিদ্যার পরীক্ষা দিলেন এবং পরীক্ষায় দুজনেই উত্তীর্ণ হলেন।

বিকেলে রোদ পড়ো-পড়ো। রাজা আর মন্ত্রী দুটি ঘোড়ায় চেপে সেই ঘোড়া হাঁকিয়ে চললেন রাজধানীর বাইরে খোলা মাঠের দিকে।

মাঠে জনপ্রাণী নেই। একধারে মস্ত একটা বিল। সেই

ঝিলে জড়ো হয়েছে রাজ্যের বক। রাজা বললেন—আসুন মন্ত্রী-মশায়, নস্যি ন্যাকে দিয়ে আমরা দুজনে বক হই……

কৌটো খুলে নাকে নস্যি দেবেন, মন্ত্রী বললেন—মন্তরটা একবার আউড়ে নি আসুন, মহারাজ। নাহলে জানেন তো, কি অনর্থ যে না ঘটবে!

রাজা বললেন—ঠিক বলেছেন।

দুজনে চেঁচিয়ে মন্তর আওড়ালেন,—

ওম্ হোম্ ফুট্-ফট্ ছট্!
মনুষ্য-দেহং পুনর্ঘট্!

মন্তর উচ্চারণ করে দুজনেই নিশ্চিন্ত হলেন—হ্যাঁ, মন্তর তাহলে ভোলেন নি!

দুজনে নাকে এক-টিপ করে নস্যি নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মুখে বললেন—বক হবো।

দেখতে দেখতে তাঁদের পাগুলো হলো লিক্‌লিকে সিড়িঙ্গে সরু; হাতগুলো হয়ে গেল বকের ডানা; গলাটা হলো সরু আর লম্বা এবং মুখ হুবহু বকের মতো ঠোঁটওয়ালা! সে-মূর্ত্তি দেখে কেউ আর কাউকে চিনতে পারলেন না!

রাজা বললেন,—জলের ধারে গিয়ে শোনা যাক বকের সভায় কিসের আলোচনা চলেছে।

দুজনে বক-বেশে এলেন জলের ধারে বেত-বনের আড়ালে।

সত্যিকারের বকের দলে তখন মস্ত আলোচনা চলেছে বকেরা বলাবলি করছে—

১। বক-রাজার এ কি মজার হুকুম বলো তো! তাঁর ছেলের বিয়েতে যত বককে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ মিলে নাচতে-নাচতে বরযাত্রী যেতে হবে!

২। এ বয়সে নাচি কি করে? কখনো কি নাচ শিখেছি? না, কেউ শিখিয়েছে?

৩। মানুষদের দেখে বক-রাজার এ খেয়াল হয়েছে। সেখানে এখন রেওয়াজ উঠেছে নাচো, নাচো! নাহলে শরীর হবে বেজুত, স্বাস্থ্য বেমজবুত!

৪। ও নিয়ম কি বকেদের খাটে?

৫। দুঃখ করে কি লাভ, বলো? রাজার হুকুম জানো তো, যে না নাচবে, তার গলাটি হবে কুচ্!

৬। আলোচনা রেখে এসো, নির্জ্জনে নাচ রপ্ত করি।

বকেরা নাচ সুরু করলে। লম্বা ঠ্যাঙ তুলে সে যা নাচ···

নাচ দেখে রাজা আর মন্ত্রী দুজনেই হো-হো করে হেসে উঠলেন। সে কি হাসি! সে-হাসি আর থামতে চায় না!

হাসতে হাসতে মন্ত্রী হঠাৎ শিউরে উঠলেন, ডাকলেন,—মহারাজ······

হাসতে হাসতে রাজা বললেন—কি বলচেন মন্ত্রী-মশায়?

মন্ত্রী তখন দু'চোখে দেখচেন সর্ষের ক্ষেত! তাঁর প্রাণ উড়ে

গেছে! তিনি বললেন—কি সর্ব্বনাশ করলুম! হেসে ফেলেছি···মন্তর?

রাজা বললেন—সে মন্তর ভোলবার জো কি! অস্ত কষে মুখস্থ করেছি। সেই তো মন্তর······

রাজা মন্তর উচ্চারণ করতে গেলেন, পারলেন না। মন্তর ভুলে গেছেন! মন্ত্রী-মশায়েরও সেই দশা!

রাজা বললেন—কি সে মন্তরটা? তাইতো! আহা, আগেকার কথা হচ্ছে ওম্! তারপর?

মন্ত্রী বললেন—ব্যোম্! না, না, তাই তো! পরের কোনো কথা আর মনে পড়ছে না যে, মহারাজ······

রাজা বললেন—ভাবুন, ভাবুন। সেই যে-কথা, ছটফট্ না, ঝটপট্! লটপট্, না, চটটট্······

নিশ্বাস ফেলে মন্ত্রী বললেন—না, না, না···ওরে বাবা, কিছুই যে মনে পড়ছে না···মাথা কট্‌কট্ করছে!

দুজনে অনেক চেষ্টা করলেন। বর্ণমালার সমস্ত অক্ষরগুলোর পছনে 'ট' বসিয়ে কত কথাই না তৈরী করলেন! কিন্তু সে মন্তর আর মনে পড়লো না! দুজনে ফটফট ভুলে যাতনায় ছটফট করে বেড়াতে লাগলেন।

সারা রাত···তার পরের দিন···তার পরের দিন।

মন্তর কিছুতেই মনে পড়লো না! দুজনে নিশ্বাস ফেলে বললেন—এ জীবনটা বক-পাখী হয়েই কাটাতে হবে শেষে...

মন্ত্রী বললেন—ছেলেমানুষের বুদ্ধিতে চলে' আজ এই দুর্দ্দশা!

এই জন্যই শাস্ত্রে বলেছে মহারাজ, বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং···তখন মানা করেছিলুম।

রাজা বললেন—দুঃখ ক মন্ত্রী-মশায়! এ্যাদ্দিন তো মানুষ ছিলুম। বাকী জীবনটা যদি বক হয়ে কাটাতে হয়···একটা নতুন কিছু হবে। এমনটি আর কারো জীবনে কখনো হয়েছে?

নিরুপায়······

দুজনে বক হয়ে উড়ে বেড়ান। লোকালয়ে যেতে গেলে মন্ত্রী মানা করেন, বলেন—না মহারাজ! কে শেষে গুলি মেরে শীকার করে বসবে! পৈত্রিক প্রাণটা যাবে!

বনে-বনে মাঠে-মাঠে দুজনে উড়ে বেড়ান। বকেরা খায় কাঁচা মাছ, পোকা-মাকড়······

মন্ত্রী বলেন—ও-সব খাওয়া মুখে রুচবে কেন, মহারাজ? দেহখানা বকের হলেও রুচি তো মানুষের!

রাজা বললেন—বনের ফল খেয়ে থাকতে পারবো না?

নিশ্বাস ফেলে মন্ত্রী বললেন—অগত্যা।

তাই হলো।

দু'মাস পরে মন্ত্রীর নিষেধ না শুনে রাজা বললেন—রাজ্যে যাবো। উড়ে-উড়ে দেখতে হবে, রাজ্যে কি কাণ্ড হচ্ছে।

বললেন—চলুন। আমারো বাসনা মহারাজ, ঘর-সংসার

আছে? না, ছেলেপিলে-গিন্নী সব না খেতে পেয়ে প্রাণে মারা গেছে?

দুজনে উড়তে উড়তে রাজ্যে এলেন। এ গাছে বসেন, ও গাছে বসেন—সে-বাড়ীর ছাদে ওঠেন, আর-এক বাড়ীর কার্ণিশে কখনো.....

হঠাৎ দেখেন, বাজনা-বাদ্যির ঘটা। পথে বেরিয়েছে মস্ত মিছিল। ব্যাপার কি?

তখনি ব্যাপার বুঝলেন। সেনাপতি-মশায় সিংহাসনটি দখল করে রাজা হয়ে বসেছেন। তাঁর অভিষেক হয়েছে। সেনাপতি-রাজা এখন বাজনা-বাদ্যি করে রাজ্য-প্রদক্ষিণে বেরিয়েছেন, প্রজাদের কাছে থেকে নজরানা আদায় করবার জন্য!

রাজা বললেন—দেখেছেন মন্ত্রী-মশায়, কত-বড় দুরাত্মা ঐ সেনাপতি!

মন্ত্রী বললেন—দেখে আর কি হবে, মহারাজ! কিছু তো করতে পারবেন না। বকের কি-বা শক্তি! কতখানি বা সামর্থ্য!

রাজা ভাবলেন, ঠিক! তিনি ভেবে এসেছিলেন, বক হয়ে রাজত্ব করা চলবে না, সত্যি। তবু এই রাজ্যেই ঐ লালদীঘির ধারে বাসা বেঁধে বাস করবেন। কিন্তু সেনাপতির স্পর্দ্ধা দেখে রাগে গা নিষ্‌পিষ্‌ করতে লাগলো। তিনি বললেন—চলুন মন্ত্রী-মশায়, এ রাজ্যে আর থাকবো না।

মন্ত্রী নিজের বাড়ীর চিল-কোঠার ছাদে বসে বসে দেখছিলেন

—ছেলেমেয়ে-গিন্নী সকলে খাশা আছেন! খাওয়া-দাওয়ার ভারী ঘটা! তাঁর আমলে ছিল মৌরুলা মাছ আর কুচো-চিংড়ি বরাদ্দ! এখন ছু'বেলা চলেছে পোলাও-কালিয়া মাছ-মাংস রাবড়ীর ধূম! তার উপরে সেদিন শুনলেন মন্ত্রিণীকে ডেকে পাশের বাড়ীর গিন্নী জিজ্ঞাসা করছেন,—মন্ত্রী-মশায় ফিরবেন কবে গো, মন্ত্রিণী-ঠাকৃরুণ?

মন্ত্রিণী বললেন—কে জানে? বুড়ো-বয়সে মৃগয়া করতে গেছেন। পায়ে বাত নিয়ে ফিরবেন'খন। তখন দেখে নেবো, সে-বাতে পায়ে কে মহামাষ তেল মালিশ করে দেয়! আমার বয়ে গেছে······

এ-সব কথা মন্ত্রীর বুকে মুগুরের মতো বাজলো। মনে-মনে তিনি বললেন, ধেত্তেরি! এদের জন্য আমি এত মায়া করি! আর মায়া নয়!

মন্ত্রী বললেন—চলুন, মহারাজ। এ রাজ্যে আর নয়। সত্যি!

উড়তে উড়তে ছুজনে কত দেশ, কত নদ, কত নদী, কত পাহাড় পার হলেন। পার হয়ে এলেন শেষে কাশীতে।

মন্ত্রী বললেন—এইখানেই বাস করা যাক মহারাজ। কাশীতে মারা গেলে আর-জন্মে মহাদেব হবো। শাস্ত্রে লেখা আছে, কাশীতে মারা গেলে শিবত্ব-প্রাপ্তি!

একটা পুরোণো পোড়ো ভাঙ্গা মন্দিরে ছুজনে আশ্রয় নিলেন।

এধারে জনপ্রাণী বাস করে না। মন্দিরের কোথাও একটা টিকটিকি-আশুর্লার দেখা মিললো না।

রাত্রে দুজনে ঘুমোচ্ছেন। নিশুতি রাত। হঠাৎ কান্নার শব্দে দুজনের ঘুম গেল ভেঙ্গে।

রাজা বললেন—কে কাঁদে?

মন্ত্রী বললেন—ভূত।

রাজা বললেন,—দেখতে হবে।

মন্ত্রী বললেন—খবর্দ্দার মহারাজ! বক হয়েও প্রাণটা যা হোক বেঁচে আছে, শেষে ভূতের হাতে সে-প্রাণ·····

রাজা হাসলেন, বললেন—ভূত আমি মানি না, মন্ত্রী-মশায়।

মন্ত্রী নিরুপায়! ছোকরা-রাজার পাল্লায় পড়ে যে-দুর্গতি ঘটেছে...আরো কি না ঘটবে ভেবে তিনি নিশ্বাস ফেললেন!

রাজা বেরুলেন—কান্নার শব্দ লক্ষ্য করে।

বেশী দুর যেতে হলো না। পাশের ভাঙ্গা নাট-মন্দিরের কার্ণিশ থেকে কান্নার শব্দ আসছিল।

রাজা চেয়ে দেখলেন। সেদিন ছিল জ্যোৎস্না রাত......... জ্যোৎস্নার আলোয় দেখেন, ঘুলঘুলিতে একটি লক্ষ্মী-প্যাঁচা!

রাজা বললেন—তুমি কাঁদচো?

লক্ষ্মী-প্যাঁচা বললে—হ্যাঁ।

রাজা বললেন—প্যাঁচার আবার দুঃখ কি?

মন্ত্রী বললেন—পোকা-মাকড় খেতে পায় নি মহারাজ, তাই কাঁদছে।

লক্ষ্মী-প্যাঁচা বললে—আমি প্যাঁচা নই। আমি হলুম মৌটুশী রাজ্যের রাজকন্যা। এক বুড়ো যাদুকর তার ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল। এসে বাবার কাছে সে-কথা বলতে বাবা রাগে চাবুক মেরে তাকে তাড়িয়ে ছ্যান। সেই অপমানে সে একদিন আমাকে বাগানে একা পেয়ে মন্তর পড়ে লক্ষ্মী-প্যাঁচা করে দেছে। সেই অবধি প্যাঁচা হয়ে আছি।···দিনের বেলায় বেরুবার জো নেই! রাজ্যের পাখী আঁচড়ে-কামড়ে-ঠুকরে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। রাত্রে বেরুতে ভয় করে। প্যাঁচার দেহ হলেও রাজকন্যা তো আমি!

রাজা বললেন,—তুমিও মন্তর ভুলে গেছ বুঝি? রাজকন্যা হবার মন্তর?

লক্ষ্মী-প্যাঁচা বললে,—অনেক দেবতার মন্দিরে কেঁদে কেঁদে ফিরেছি,—আমার মন্তর নেই! কোনো দেবতার দয়া হয় নি। শেষে এই কাশীতে এসে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের কোটরে আশ্রয় নিয়েছিলুম। রোজ রাত্রে বাবার কাছে কেঁদে কাকুতি জানিয়েছি, আবার আমায় মানুষ করে দাও, বাবা! রাজকন্যা না করো, গরীব-ভিখিরী করে দাও, তাতে আমি স্বর্গ পাবো! বাবা দয়া করলেন! বললেন, পোড়া-মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নে। আর-কোনো মানুষ যদি তোর মত যাদুকরের যাদুতে পাখী হয়ে তোর কাছে কখনো আসে, তবে তার দ্বারা শুধু তোর মুক্তি হতে পারে। নাহলে মুক্তির অন্য কোনো উপায় নেই!········তাই আমি রোজ কাঁদি। কেঁদে বাবা-বিশ্বনাথকে

বলি, হে বাবা-বিশ্বনাথ, কবে এমন মানুষ-পাখী তুমি এখানে এনে দেবে?

রাজা বললেন,—বটে! তাহলে তোমার ভয় নেই। আমরা সত্যিকারের বক নই। যাদু-মায়ায় আমরা বক হয়ে আছি!··· কিন্তু আমাদের মানুষ হবার যে-মন্তর, সে-মন্তর আমরা ভুলে গেছি। কে-বা সে মন্তর বলে দেবে? কাজেই আমাদের উদ্ধারের আর আশা দেখছি না।

—নাঃ! বলে' মন্ত্রী ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠলেন।

লক্ষ্মী-প্যাঁচা বললে—তোমার যাদুর বৃত্তান্ত আমাকে বলতে পারো?

রাজা বললেন—নিশ্চয়।

রাজা তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন।

শুনে লক্ষ্মী-প্যাঁচা বললে—বুঝেছি। এ'ও সেই যাদুকরের কাজ। তার ছেলে—সেই তো তোমার রাজ্যে সেনাপতি ছিল। এখন রাজা হয়ে তোমার সিংহাসনে বসেছে। আচ্ছা, দাঁড়াও, সে মন্তর আমি উদ্ধার করে দেবো।

রাজা বললেন—কি করে?

লক্ষ্মী-প্যাঁচা বললে—সেই যাদুকর তার দল নিয়ে এই ভাঙ্গা মন্দিরে আসে······প্রতি-অমাবস্যায়। এখানে এসে কালী-পূজো করে। তা অমাবস্যার তো আর দেরী নেই! সে এসে এখনো আমাকে লোভ দেখায়। বলে, তার ছেলেকে যদি বিয়ে করি, তাহলে সে আবার আমাকে রাজকন্যা করে দেবে।······

এবারে সে এলে বুদ্ধি করে' তোমাদের মন্তর আমি ঠিক আদায় করে নেবো।......

অমাবস্যার দিন গভীর রাত্রে যাদুকর এলো। সঙ্গে দশ-বারো জন সঙ্গী। ক'জনে মিলে কালী-পূজো করলে। তারপর খাওয়া-দাওয়া।

খেতে বসে লক্ষ্মী-প্যাঁচাকে ডাকলে, বললে—আমার কথায় রাজী আছো? বলো, আমার ছেলেকে বিয়ে করবে? সে এখন এক রাজ্যের রাজা। আমার শক্তি বুঝচো তো!

লক্ষ্মী-প্যাঁচা বললে—উঃ, ভারী তো শক্তি! আমার মতো একটা বাচ্ছা-মেয়েকে ভুলিয়ে লক্ষ্মী-প্যাঁচা করা—এতে আবার শক্তি কি? এমন শক্তির আর-কোনো পরিচয় কোথাও দিয়েছো, বলতে পারো?

তাচ্ছল্যে অট্টহাস্য-রব তুলে যাদুকর বললে—দিই নি?

যাদুকর তখন রাজার আর মন্ত্রীর বক হবার বৃত্তান্ত খুলে বললে!

শুনে লক্ষ্মী-প্যাঁচা বললে—তাদের আবার মানুষ করে দিতে পারো···আছে তোমার এমন শক্তি?

যাদুকর বললে—নেই? হা-হা-হা! একটা মন্তর আছে। সে-মন্তর

ওম্ হোম্ ফুট্-ফট্ ছট্।
মনুষ্য-দেহং পুনর্ঘট্!

রাজা আর মন্ত্রী ছিলেন পাশের ঘরে ওৎ পেতে। যাতুকর যেমন মন্তর বলেছে, অমনি তুজনে সঙ্গে সঙ্গে সেই মন্তর উচ্চারণ করলেন! দেখতে দেখতে তুই বক তখন একেবারে সেই আগেকার রাজা আর মন্ত্রী!

রাজা এক-মুহূর্ত্ত দাঁড়ালেন না! খোলা তলোয়ার হাতে পাশের ঘরে ঢুকে যাতুকরের গলায় দিলেন বসিয়ে একটি চোট্! ধড় থেকে যাতুকরের মাথাটি কুচ্ করে' কেটে মাটীতে লুটিয়ে পড়লো। রক্তের ফোয়ারা ছুটলো।...

খোলা-তলোয়ার হাতে পাশের ঘরে ঢুকে

ব্যাপার দেখে যাদুকরের লোকজন একেবারে হতভম্ব!

গর্জ্জন করে রাজা বললেন—এইবারে তোদের পালা! তোরা ঐ দুরাত্মার সঙ্গী···

ভয়ে তারা রাজার পায়ের উপর পড়ে মিনতি-ভরে বললে—দোহাই মহারাজ, আমাদের ক্ষমা করবেন। আমরা যাদুবিদ্যা জানি না। ওর কালী-পুজোয় আমরা নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলুম। ও বললে, দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজন করাবে—তাই। আমরা ব্রাহ্মণ, মহারাজ!

এ কথা বলে' তারা পৈতে তুলে দেখালে।

রাজা বললেন—যাও, তোমাদের ক্ষমা করলুম। কিন্তু ফের যদি দেখি তোমরা এমন বাঁদরামি করে বেড়াচ্ছো, তাহলে ব্রাহ্মণ বলে তোমাদের ছাড়বো না! বদমায়েস্‌-বাঁদর বলে এই তলোয়ারের চোটে···বুঝেছো?

তারা বলে উঠলো—খুব বুঝেছি, মহারাজ···

বলেই তারা পড়ে-কি-মরে এমনিভাবে দিলে চম্পট!

তারপর রাজার নজর পড়লো ঘরে। লক্ষ্মীপ্যাঁচা? লক্ষ্মী-প্যাঁচা কোথায় গেল? নেই! তার বদলে সুন্দর একটি মেয়ে! এ মেয়ে কোথা থেকে এলো?

হেসে মেয়েটি বললে,—আমি সেই লক্ষ্মীপ্যাঁচা। আমার যাদু কেটে গেছে মহারাজের কৃপায়।

মন্ত্রী বললেন—আপনি তাহলে আপনার বাপের রাজ্যে যাবেন এখন ?

মেয়ে বললে,—মহারাজ যদি অনুমতি দ্যান্! উনি আমায় উদ্ধার করেছেন। ওঁর অনুমতি ছাড়া কোথাও আমার যাবার জো নেই।

এবারে মন্ত্রীর মন্ত্রী-বুদ্ধি খুললো। মন্ত্রী বললেন—এক কাজ করুন মহারাজ। উনি হলেন রাজকন্যা, আপনিও মহা-রাজা—আইবুড়ো-রাজা। তার উপর দুজনেই পক্ষী-জন্ম ধারণ করেছিলেন। এমন রাজযোটক মিল! রাজকন্যাকে মহারাজ বিয়ে করে ফেলুন। তারপর মহারাণীকে সঙ্গে নিয়ে শ্বশুর-বাড়ী ঘুরে নিজের রাজ্যে ফিরুন। সেখানে সিংহাসন জুড়ে বসে আছে আর-একটা পাপাত্মা দুর্জ্জন। তাকে শায়েস্তা করে নিজের বেদখল-সিংহাসন আবার নতুন করে দখল করে' তাতে চেপে বসবেন।

রাজা বললেন—বেশ কথা বলেছেন মন্ত্রী-মশায়! কিন্তু এতদিন পরে রাজ্যে ফিরে গেলে সকলে যখন জিজ্ঞাসা করবে, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলেন মহারাজ ?

মন্ত্রী বললেন—তার জবাব আমি দেবো। আমি বলবো, রাজ্যে যোগ্য পাত্রী পাইনি বলে অনেক দূরের এক রাজ্যে গিয়ে

সেখানকার রাজকন্যার সঙ্গে মহারাজের বিয়ে দিয়ে মহারাণী নিয়ে রাজ্যে এলুম।

এবং তাই হলো। রাণী নিয়ে রাজা রাজ্যে ফিরলেন। শ্বশুর-রাজার সৈন্য-সামন্ত এলো সঙ্গে। এ খপর পাবামাত্র সিংহাসন ছেড়ে সেনাপতি যে কোথায় চম্পট দিলে, আজ পর্য্যন্ত তার কোনো সন্ধান মেলে নি!
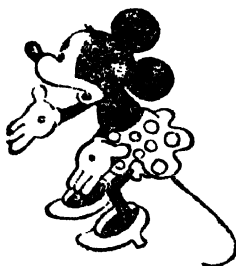
পাঁচুর বৌ

পাঁচুলাল দাস—উলুবেড়ে বাস।
জমি-জমা আছে, করে তার চাষ।
নাই কোনো দায়,
দিন চলে যায়!
ছেলে-পিলে নাই, আছে এক স্ত্রী।
ছুটি প্রাণী শুধু—চাই বলো কী?

অভাব না থাক্, ছিল নাই সুখ!
কারণ, সে স্ত্রী—তার যা মুখ!
ঝগড়ার চোটে
কাক-চিল মোটে
সে-বাড়ীর ধারে ঘেঁষতে না পারে!
মানুষ কি ছার—ভূত-প্রেত হারে!

শুধু বকাবকি? বাপ্! কিল-চড়, ঘুষি,
চ্যালা কাঠ, হাতা, যখন যা-খুশী
পাঁচুকে সটাং
লাগায় পটাং;
পিঠ তায় ভাঙ্গে, নাক যায় ঝুলে—
সেদিকেতে বৌ তাকায় না মূলে!

ঘরে তার যুদ্ধ, ঝগড়া ও ঝাটী—
নাই তার বিশ্রাম ! মাঠে কেটে মাটী,

এটা-সেটা বুনে,
ক' পহর গুণে

বাইরে যা থাকে, আরাম সেটুক্ !
ঘরে ফেরা মনে হলে, ভয়ে ধুক্ ধুক্ !

হেথা-সেথা বন্ধু যা ছিল তুই-চার,
পাঁচুকে সকলে বলে,—এত সহিবার

প্রয়োজন কি রে ?
তুরন্ত স্ত্রীরে

কষে মার্ গাঁট্টা। সে তো মেয়ে-লোক !
ধর্ তেড়ে ঝুঁটি—বৌ ঢিট্ হোক্ !

বলে,—তুই মরদ ! গায়ে নেই জোর ?
নিজ-ঘরে নিজে হয়ে র'বি চোর !

লজ্জাও নাই ?
আরে, দূর ছাই !

জোরে না পারিস্ যদি, না মারিস্ তেড়ে—
ধেৎ তেরি,—বনে যা'না বাড়ী-ঘর ছেড়ে।

পাঁচু অতি কাঁচু-মাচু বলে,—ভাই, হারে,
মেয়ে বটে! ঝাঁজ কি সে! চেনো না তো তারে!

কত বড় দস্যি!
জ্ঞান দীর্ঘ-হ্রস্বি

নাই তার! না হলে কি মারে এত রেগে!
কি সে জোর্ মার্ ভাই, কি প্রবল বেগে!

ভাবে নাকো, পারি সেই-মারে মরে যেতে!
—মনে তার কি যে হবে! ওঠে এত মেতে

যেন ক্ষেপা দানা!
পুলিশ, কি, থানা—

কারে করে নাকো কেয়ার, ভাবে নাকো তিলে।
ছ'শো ভূত ভাগে ভাই, তার এক-কিলে!

বন্ধুরা দুখে দুখী! ভাবে, এর উপায়
করা চাই। না হলে যে পাঁচু মারা যায়!

দিল পরামর্শ;
শুনে মনে হর্ষ

হলো পাঁচুর; সে-হর্ষকে মনেতে সে চেপে
ঘরে এলো; এসে দেখে, বৌ আছে ক্ষেপে!

বৌ তার কি মেজাজ! সব-ক্ষণ তপ্ত!
আজো সে মারবে! মার্ খুব রপ্ত!

বলে,—হাসি-মুখ···
কেন? কিসে সুখ?

খেটে আনো কত টাকা? কত আনো ধান?
বলো, হাত-নিশ্‌পিশ্‌—রাগে জ্বলে প্রাণ!

বৌটার খুব কাছে ছিল এক জাঁতা।
নিল বৌ। পাঁচু ভাবে, গেল আজ মাথা!

ভয়ে বলে,—ওগো,
এর পরে বোকো—

তার পরে মেরো, খুশী তোমার যত—
আগে শোনো কথা মোর—শুনিবার মত।

বৌ বলে পাঁচুর সে-কথা শোনার আগে,—
চালাকি তোমার আর ভালো নাহি লাগে!

কথার ভটচায্যি!
নাই কোনো কায্যি—

ষোল-আনা ফাঁকি দিতে মাঠে থাকো, কুড়ে!
আমি ঘরে খেটে-মরি-জ্বলে ভেতে পুড়ে!

পাঁচু বলে—সত্যি, নিত্যি তোকে জ্বালাই।
ঘুচোতে চাই তো তাই তোর সে বালাই!

বলি সত্যি করে,
প্রত্যয় না ধরে,—

গঙ্গা-তীরে চল্,—গঙ্গা দেবী—জানিস্!
সেথা মিথ্যা বলা না যায়, এ কথা মানিস্!

গঙ্গায় অ-থৈ জল, জলে স্রোত খরা।
এ-পার ও-পার শুধু জলে-জলে ভরা!

ঘুর্ণীর চক্কর্।
যেন অজগর

ফুঁশছে কি! বাপ্! কুকুর-বেরাল-ছানা,—
কিম্বা কুটো পড়লেই ভেঙ্গে ঘোলখানা!

ভাবে বৌ, সত্যি তো, দেবী গঙ্গা-নদী!
খুব পাপ হবে, সেথা মিথ্যা বলে যদি!

বল্লে,—হুঁ, চল্,
দেরীতে কি ফল!

(বলে রাখি এক কথা হয়নি কো বলা—
এটি ভাদ্র মাস; ভাদ্রে গঙ্গা স্রোতোচ্ছলা!)

একটু সে চর,—জমির ফালিমাত্র
জেগে আছে। জলে-ডোবা পৃথিবীর গাত্র !

সেই চরে এসে
বলে পাঁচু···কেশে,—

তোর আপদ দূর হবে। উপায়টি বলি,
আমি মলে অর্থাৎ আপদ যাবে চলি !

আত্মহত্যা পাপ ! সাহস নেই তারি।
আমার হাত-পা বাঁধ্,—যাতে নড়তে না পারি !

বাঁধা পায়ে-হাতে
চরের সীমানাতে

আমি দাঁড়াই। তুই দূরে ঐ ওক্‌খান থেকে ছুটে
এসে মার্ ধাক্কা—জলে পড়ি লুটে।

জলের তোড়ে পড়লে শক্তি হবে নাকো
উঠে বাঁচি ! দোহাই, মোর এ কথাটি রাখো—

ওঠার ভরসা
বেবাক্ ফরসা !

একা তখন থাকবি কেয়া মজার হালে—
চুবন খেয়ে আমি ডুবে ম'লে সন্ধ্যাকালে !

ভাবে বৌ, বেশ তো এ! উত্তম ফন্দী!
এ-মরায় রটবে না নিন্দার গন্ধী!

বললে সে,—বেশ তো!
বাঁধলো দুরন্ত!

বদ্ধ-হস্ত-পদে পাঁচু দাঁড়ায় চরের ধারে।
বৌ গেল বহুৎ দূরে·· যত্ত দূরে পারে!

তখ্‌খুনি এলো ছুটে বেগে পাঁচুর দিকে।
পাঁচু একটু হঠে দাঁড়ায়; অমনি ছোটার টিকে

বেসামালে টলে
বৌ পড়ে জলে।

পড়ে টানে ভেসে চলে নেহাৎ নিরুপায়ে।
চ্যাচায়,—ওগো, বাঁচাও, রক্ষে করো, পড়ি পায়ে।

পাঁচু বলে,—রক্ষে! হেঁ-হেঁ···আমি দড়ি-বাঁধা!
কেমন করে বাঁচাই বৌ? মিছে তোর কাঁদা!

অর্থাৎ তাই তো!
উপায় নাই তো!

তা, তা তোর মাথা গরম, মেজাজ গরম আরো—
জলে ঠাণ্ডা হবে। ডুব দাও, যত-খুশী পারো।

সন্ধ্যা আরো গাঢ় হয়ে নামে জলের 'পরে !
খর স্রোতে পাঁচুর বৌ চুবন খেয়ে মরে।

ভাসে, ডোবে, ভাসে—
পাঁচু তাকায় ত্রাসে !

ওই যাঃ ! বৌঁ···বৌঁ···গেল সোজা জলের তলে,-
বাঁধন খুলে পাঁচু মুক্ত বাড়ীর পথে চলে !

যাদুর যাদু

এ সেই আদ্যিকালের কথা—যাদু-বিদ্যার জোরে পৃথিবীতে মানুষ যখন অসাধ্য-সাধন করতো !

যাদু-বিদ্যার স্রোতে তখন ভাঁটা পড়ে আসছে। অর্থাৎ যাদু-বিদ্যার যাঁরা গুরু, শিষ্যদের এ-বিদ্যা শেখাতে তাঁদের তখন আর আস্থা নেই ! শিষ্যরা গুরুদের কাছে যাদু-বিদ্যা শিখে সে-বিদ্যার জোরে গুরুদের নাকাল করছিল। কাজেই যাদু-বিদ্যার গুরুরা সভা ডেকে সঙ্কল্প করলেন, আর কাকেও এ-বিদ্যা শেখানো হবে না ! অনেকে বললে—এমন বিদ্যা লোপ পাবে ? তাঁরা বললেন—পাক্ লোপ ! এর পরে মানুষ নব-বিজ্ঞান শিখুক। সে নব-বিজ্ঞানে আর যাই হোক্, গুরু-মারা বুদ্ধি কারো হবে না !

পণ নিয়ে গুরুরা যাদু-বিদ্যা শেখানো যখন বন্ধ করেছেন, আমরা সেই তখনকার কথা বলছি।

সব গুরু তখন মারা গেছেন, শুধু নবদ্বীপে বেঁচে আছেন একজন গুরু ; যাদু-পণ্ডিত। তাঁর নাম নিগমানন্দ। নিগমানন্দর বয়স হয়েছে আশী বৎসর। তাঁর মাথায় দীর্ঘ জটাজুট। লম্বা

দাড়ি-গোঁফের ঝোপ থেকে মুখখানিকে খুঁজে বার করতে বেশ খানিকটা সময় লাগে! নদীর ধারে তাঁর আশ্রম। এই আশ্রমে গুরু নিগমানন্দ বাস করেন ; আর তাঁর সঙ্গে থাকে পুরোনো ভৃত্য দামু।

একদিন সকালে আশ্রমের সামনে বটচ্ছায়ায় বসে গুরু নিগমানন্দ তল্পী খুলেছেন। তল্পীতে আছে মামীর-মার রকমারি খেল,—ছোট-বড় নুড়িনোড়া, দর্পণ, কাঁকুই, প্রদীপ, অঙ্গুরী, মধুপর্কের বাটি, চন্দন-কাঠের টুক্‌রো, বন-মানুষের হাড়, মানুষের মাথা—এমনি সব জিনিষ! গুরু সেগুলি নাড়া-চাড়া করছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে পুঁথির পাতায় লেখা শ্লোক আওড়াচ্ছেন। এমন সময় দীনবেশে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো সন্দীপ।

তরুণ যুবা। সন্দীপের দু'চোখে বুদ্ধির দীপ্তি।

সন্দীপ এসে গুরু নিগমানন্দর পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। গুরুর পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায়-গায়ে মাখলে—মেখে করজোড়ে গুরুর সামনে দাঁড়ালো।

নিগমানন্দ বললেন,—কে তুমি ?

সন্দীপ বললেন,—আজ্ঞে, আমার নাম সন্দীপ। নবদ্বীপ, বারাণসী, কনৌজ, নালন্দা—সে-সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমি নানা উপাধি পেয়েছি, প্রভু! সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা করেছি। কিন্তু আপনার কৃপায় যাদু-বিদ্যা শিক্ষা না করলে আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না! তাই আমি আপনার

চরণে এসেছি। আপনি আমাকে যাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিন। নাহলে আপনি মরে গেলে পৃথিবী থেকে এ-বিদ্যা বিলুপ্ত হয়ে যাবে যে!

নিগমানন্দ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সন্দীপকে দেখলেন। বললেন,—এ শিক্ষা লোপ পাবে, সন্দেহ নেই! কিন্তু উপায় কি?

সন্দীপ বললে—দয়া করে আমাকে এ-বিদ্যা শেখান।

নিগমানন্দ বললেন—এ বিদ্যা তুমি যে শিখবে বলছো, শেখবার যোগ্যতা তোমার আছে?

সন্দীপ বললে—পরীক্ষা করুন।

নিগমানন্দ বললেন—বেশ!

নিগমানন্দ অনেকক্ষণ সন্দীপের পানে তাকিয়ে রইলেন। দু'চোখে সন্ধানী দৃষ্টি! তারপর বললেন—তোমাকে যদি আমি কুবেরের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার দান করি? করে বলি, এখনো যাদু-বিদ্যা শেখবার বাসনা আছে?

সন্দীপ বললে—সে-ঐশ্বর্য্য উপেক্ষা করে তবু আমি যাদু-বিদ্যা শিখবো।

নিগমানন্দ বললেন—যদি তোমাকে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর করে দি? গৌরবে-শক্তিতে বিভূষিত করি?

সন্দীপ বললে—তবু আমি সে সিংহাসন নেবো না প্রভু, যাদু-বিদ্যা শিখবো।

নিগমানন্দ বললেন—আমোদ-প্রমোদ ঐশ্বর্য্য-সম্পদ খ্যাতি-কীর্ত্তি—এ সব যদি তোমাকে ত্যাগ করতে বলি? যদি বলি,

এ-সবের বাসনা ত্যাগ করলে তবে আমি তোমাকে যাদু-বিদ্যা শেখাবো ?

সন্দীপ বললে—সে-সব আমি ত্যাগ করবো প্রভু।

নিগমানন্দ বললেন—বটে ! বেশ !···

তারপর নিগমানন্দ কি ভাবলেন, ভেবে বললেন—অনেকখানি পথ হেঁটে তুমি ক্লান্ত। খিদে পেয়েছে, বোধ হয় ?

সন্দীপ বললে—আজ্ঞে, খিদে-তেষ্টায় আমি আকুল !

—হুঁ ! নিগমানন্দ ডাকলেন—দামু···

দামু এলো। নিগমানন্দ বললেন—এই ছেলেটির জন্য ছানা-ননী-মাখন-মিছরী নিয়ে এসো। আর সেই সঙ্গে অমনি এক-কমণ্ডলু খাবার জল।

দামু ছানা-ননী আনতে গেল। নিগমানন্দ তখন সন্দীপের হাত ধরে তাকে কাছে বসালেন,—তারপর কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে সন্দীপের মাথায় ছিটিয়ে দিলেন, দিয়ে বললেন—আমার সঙ্গে এসো।

নিগমানন্দ চললেন বনে। বনে এক পোড়ো বাড়ীতে এলেন। বাড়ীর ছাদে উঠলেন। সন্দীপও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছাদে উঠলো।

গুরু তাকে বললেন—চোখ বুজে বসো।

সন্দীপ চোখ বুজে বসলো। গুরু তার মাথায় হাত রেখে কতকগুলি মন্ত্র পড়লেন, তারপর বললেন—চোখ খোলো।

সন্দীপ চোখ খুললো।

নিগমানন্দ বললেন—ক'টা পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছো। এখন শেষ-পরীক্ষা বাকী। এ-বিদ্যার জন্য তুমি কুবেরের ঐশ্বর্য্য, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরত্ব, আমোদ-প্রমোদের বাসনা বর্জ্জন করেছো। এখন দেখতে চাই, গুরুর আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতে পারো কি না! যাদু-বিদ্যা শিখতে হলে সব-চেয়ে বেশী দরকার গুরু-ভক্তি! এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে যাদু-বিদ্যায় আমি তোমাকে বিশারদ করে দেবো।

সন্দীপ বললে—পরীক্ষা করুন, প্রভু।

গুরু নিজের কাঁধ থেকে উত্তরীয় খুললেন। তারপর ললাটে, বুকে, দুই কর-তলে সিঁদুর-লেপ দিলেন; দিয়ে উত্তরীয়খানি কোমরে বাঁধলেন; বেঁধে সন্দীপকে বললেন—তুমি খুব জোরে এর খুঁট্ ধরে থাকো। বায়ু-পথে আমি যাত্রা করবো। যদি তুমি উত্তরীয় ছেড়ে দাও, তাহলে তখনি মাটীতে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সাবধান!

তাই হলো।

গুরুর কোমরে-বাঁধা উত্তরীয়খানি সন্দীপ দু'হাতে চেপে ধরলো। তারপর নিগমানন্দ ছাদ থেকে বাতাসের বুকে ঝাঁপ দিলেন,—মানুষ যেমন নদীর জলে ঝাঁপ দেয়, তেমনি! তারপর জলে যেমন মানুষ সাঁতার দেয়, নিগমানন্দ তেমনি বাতাসে

সাঁতার দিয়ে শূন্যপথে এগুতে লাগলেন, তাঁর পিছনে ঝুলছে উত্তরীয় ধরে সন্দীপ।

দুজনের পায়ের নীচে পৃথিবী ক্রমে কুয়াশা-বাষ্পে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুদিন দু'রাত্রি বাতাসে সাঁতার দিয়ে নিগমানন্দ এসে দাঁড়ালেন এক তুঙ্গ-গিরির শিখরে। গিরির বুকে তৃণ-পল্লবের চিহ্ন নেই—শুধু জীব-জন্তুর অস্থি জমে আছে!

উত্তরীর-গ্রন্থি খুলে নিগমানন্দ বললেন—দাঁড়াও, সন্দীপ।

সন্দীপ দাঁড়ালো।

নিগমানন্দ বললেন—এবারে যা দেখবে, তাতে ভয় পেয়ো না।

সন্দীপ বললে—না।

একটি ফুৎকারে নিগমানন্দ অগ্নি জ্বাললেন,—দ্বিতীয় ফুৎকারে সে আগুন নিবিয়ে দিলেন। আগুন নিবলে সামনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী জাগলো।

দেখতে দেখতে ধোঁয়ার সে-কুণ্ডলী বিরাট-বিশাল হয়ে উঠলো এবং সে ধোঁয়া মিলিয়ে গেলে ক্রমশঃ প্রকাশ পেলো এক মস্ত প্রাসাদ। প্রাসাদের ফটকে এক বিরাট দৈত্য। তার চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটা! দৈত্যটা নিগমানন্দর দিকে তেড়ে

এলো। নিগমানন্দ একমুঠো বাতাস ছুড়ে দিলেন—দেখতে দেখতে দৈত্যের দেহ ছাইয়ের রাশিতে পরিণত হলো।

সন্দীপ অবাক! তার সর্ব্বদেহে রোমাঞ্চ-রেখা ফুটলো।

নিগমানন্দ বললেন,—এবারে এসো, পুরী প্রবেশ করি।

ফটক পার হয়ে পাথরে-বাঁধানো পথ। তার পর মস্ত দালান, মস্ত ঘর। দশ-বারোটা ঘর-দালান পার হয়ে আর একটা ঘর। এ ঘরের মেঝে-দেওয়াল সব মার্ব্বেল পাথর দিয়ে তৈরী।

এ ঘরে এসে নিগমানন্দ বললেন,—আমার পিছনে দাঁড়াও। খবর্দ্দার, সামনে বা পাশে থেকো না। এখনি এক দৈত্য আসবে। তার সঙ্গে আমার যুদ্ধ চলবে। সে যুদ্ধের পর দেখবে, আমি অচেতন হয়ে পড়ে যাবো। আমি অচেতন হলে তুমি সামনের ঐ দরজা দিয়ে ওদিক্‌কার ঘরে যাবে। সে-ঘরে কোনো দ্রব্য স্পর্শ করবে না, কোনো-কিছুর পানে চেয়ে দেখবে না। শুধু দেখবে একটি কমণ্ডলু। কমণ্ডলুটি নিয়ে চলে আসবে। এসে সেই কমণ্ডলুর জল আমার সর্ব্বাঙ্গে ছিটিয়ে দেবে। বুঝলে?

সন্দীপ বললে—বুঝেচি, প্রভু।

নিগমানন্দ বললেন—মনে রেখো। আমার এ সব কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। সাবধান! এ বড় কঠিন পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই তোমার জয়-জয়কার!

সন্দীপ বললে—আপনার সব কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো, প্রভু।

নিগমানন্দ তখন একটি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সামনের ঘরের দরজা গেল খুলে; এবং অতর্কিতে এক ত্রিশির দানব এসে নিগমানন্দর সামনে দাঁড়ালো।

তুজনে দারুণ যুদ্ধ চললো। ভীষণ চীৎকার! সে-চীৎকারে কাণে তালা লাগে! সন্দীপের বুকের মধ্যে যেন সপ্ত সাগর টলমল করে উঠলো! সমস্ত পৃথিবী যেন ভূমিকম্পের বেগে তুলতে লাগলো! সন্দীপের মাথা ঘুরে গেল। সে বুঝি পড়ে যাবে!

কিন্তু পড়ে গেল না! হঠাৎ চোখের সামনে থেকে কুয়াশা-জাল অন্তর্হিত হলো। তখন সন্দীপ দেখে, দানবটা মরে গেছে এবং গুরুর দেহ তন্দ্রাভরে নিস্পন্দ হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে। গুরু অচেতন।

সন্দীপের মনে পড়লো গুরুর আদেশ। এবারে সন্দীপকে যেতে হবে ঐ সামনের ঘরে। কমণ্ডলুতে জল আছে...

সন্দীপ নিঃশঙ্ক মনে সে-ঘরে ঢুকলো। ঘরে হাজার ঝাড়ে হাজার বাতি জ্বল্‌ছে। আলোয় আলো! সে-আলোয়

সন্দীপ দেখে, ছোট একটি চৌকির উপরে কমণ্ডলু; আর সে চৌকির পাশে সোনার পালঙ্ক। পালঙ্কে শুয়ে আছেন পরীর মতো এক রূপসী কন্যা! কন্যা গভীর নিদ্রায় অচেতন!
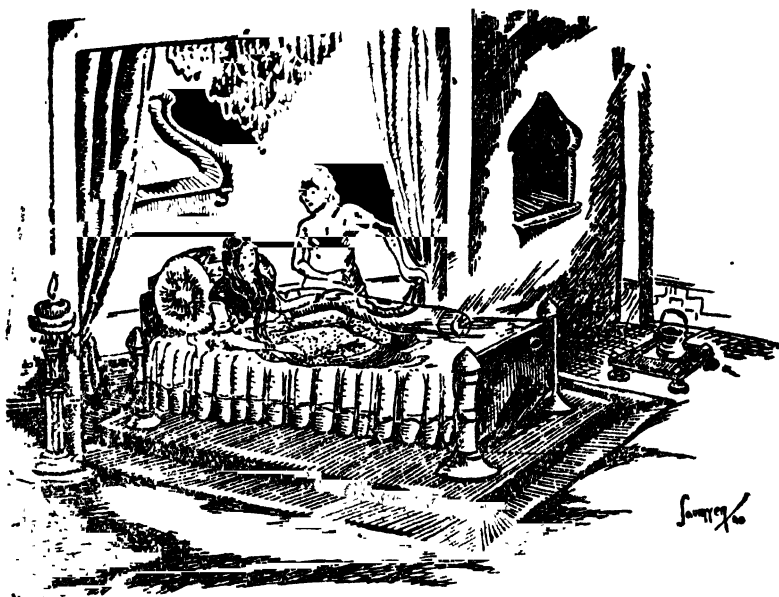
এমন রূপসী কন্যা সে কোথাও ছ্যাখেনি!

সন্দীপ কমণ্ডলু নিলে, তার পর কন্যার পানে চেয়ে দেখলে। এমন রূপসী কন্যা সে কোথাও ছ্যাখেনি! এমন রূপসীর কথা কোনো রূপকথার গল্পেও সে পড়েনি!

তার চোখ কন্যার দিক্ থেকে আর ফিরতে চায় না!

গুরুর আদেশ সে ভুলে গেল। কন্যার কাছে এগিয়ে

এলো। কন্যার হাত ধরে সন্দীপ বললে,—তুমি বেঁচে আছো? না, পাষাণ হয়ে গেছ গো কন্যা?

এ কথায় ঘুম ভেঙ্গে কন্যা ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। বসে বললেন,—তুমি এসেছো! আঃ! নাহলে আমার এ-ঘুম কোনোকালে ভাঙ্গতো না! জানো, এক-হাজার বছর ধরে আমি ঘুমোচ্ছি! কেউ এসে ঘুম ভাঙ্গায়নি। মানুষ কি এত-ঘুম ঘুমোতে পারে? আর কিছু দিন ঘুমোলে নিশ্চয় আমি মরে যেতুম!

সন্দীপ অবাক! তার মুখে কথা নেই, চোখে পলক পড়ে না!

কন্যা বললেন—এই প্রাসাদে হাজার রাজার ঐশ্বর্য্য আছে। সে-সব তোমার হবে। তুমি আমাকে বিয়ে করো। বিয়ে করে এ রাজ্যের রাজা হয়ে তুমি সিংহাসনে বসো। তোমার কোনো অভাব থাকবে না! সকল-সুখে তুমি সুখী হবে।

সন্দীপের বুকখানার মধ্যে যা হচ্ছিল, যেন সাগর ফুঁশে উঠছে!

সন্দীপ বললে—দাঁড়াও কন্যা, আগে গুরুর আদেশ পালন করি। তারপর আমি তোমার কাছে আসবো।

কন্যা বললেন—গুরু?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ। ঐ পাশের ঘরে তিনি অচেতন হয়ে শুয়ে আছেন!

কন্যা এলেন সন্দীপের সঙ্গে দোরের কাছে। নিগমানন্দকে

দেখে কন্যা বললেন—সর্ব্বনাশ! ও যে যাদুকর নিগম। উনি তোমার গুরু?

সন্দীপ বললে,—উনি আমার গুরু!

কন্যা বললেন,—তুমি এখন কি করতে চাও?

সন্দীপ বললে—এই কমণ্ডলুর জল ওঁর সর্ব্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিতে হবে।

কন্যা শিউরে উঠলেন, বললেন,—খবর্দ্দার, অমন কাজ করো না! আমার কথা শোনো, তোমার হাতে ঐ যে জল, ও-জল হলো জীবন-বারি! ও জল ওঁর গায়ে দিলে এখনি উনি যৌবন পেয়ে জেগে উঠবেন! জেগে উঠে উনি এই রাজ্য, প্রাসাদ, ঐশ্বর্য্য···সব নেবেন! আর আমাকে বিয়ে করে ওঁর রাণী করবেন। তোমার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে! এমন কাজ করো না। তার চেয়ে আমি যা বলি, শোনো। কমণ্ডলুর পাশে আছে একখানি খাঁড়া। সেই খাঁড়া নাও; নিয়ে ওঁর বুকে বসিয়ে দাও। তাহলে এই রাজ্য, সিংহাসন, প্রাসাদ, ঐশ্বর্য্য আর আমি···সব তোমার হবে।

এ কথা শুনে সন্দীপ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো!

কন্যা বললেন—যাও। যা বললুম, করো। দেরী নয়!

খাঁড়া নিয়ে সন্দীপ চললো নিগমানন্দর দিকে।

নিগমানন্দ পড়ে আছেন নিস্পন্দ! সন্দীপ এসে খাঁড়া তুলে যেমন গুরুর বুকে বসাবে ··

প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো। যেন আকাশখানা ভেঙ্গে পৃথিবীর বুকে পড়লো এবং পৃথিবী যেন মুহূর্ত্তে ফেটে চৌচির!

ভয়ে চম্‌কে সন্দীপ চোখ বুজলো।

আবার যখন সে চোখ মেলে চাইলো, দেখলে, আশ্রমের সামনে বটবৃক্ষচ্ছায়ে বসে আছেন গুরু নিগমানন্দ। তাঁর সামনে সেই মামীর-মার খেল,—নোড়া-নুড়ি, চন্দন-কাঠ, বনমানুষের হাড়—রাজ্যের টুকিটাকি!

কোথায় সে প্রাসাদ! কোথায় সে সোনার পালঙ্ক! কোথায় সে পরীর মতো রূপসী কন্যা! মায়া-মন্ত্রে সব অদৃশ্য হয়ে গেছে!

নিগমানন্দ ডাকলেন—দামু···

দামু এলো।

নিগমানন্দ বললেন—ছানা-ননী আর আনতে হবে না। এ-ছোকরা শিষ্য হবার যোগ্য নয়। ওকে যাদু-বিদ্যা শেখাবো না। শেষ-পরীক্ষায় ও আর উত্তীর্ণ হতে পারলে না।

বেচারা সন্দীপ মলিন-মুখে ঘরে ফিরে এলো। যাদু-বিদ্যা শিক্ষার এমন সুযোগ হারিয়ে ফেলে সেই মামুলি শাস্ত্র-পুরাণের বিদ্যা নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হলো।

বুদ্ধিমতী কন্যা

এক গ্রাম। সে গ্রামে বাস করেন ত্রিলোচন। রাজ-সরকারে ত্রিলোচন নকল-নবীশের কাজ করেন।

বাড়ীতে থাকেন তিনি; তাঁর তিন ছেলে; বড় আর মেজ ছেলের দুই বৌ। এই ছ'টি লোকের বাস। ত্রিলোচনের স্ত্রী মারা গেছেন। সংসারের ভার এখন দুই বৌয়ের হাতে।

বৌ দু'টির বয়স বেশী নয়। সংসারে তাদের নানা কাজ করতে হয়। বাটনা-বাটা, রান্নাবান্না, বাসন-মাজা, ঘর-ঝাঁট দেওয়া,—মানে, সব! কোথাও তারা একবেলার জন্য বেরুতে পায় না! সময় নেই! সংসারে মাথা গুঁজে দু'বৌ থাকে।

দিন যায়। একদিন বৌদুটির মন কেমন করতে লাগলো। আহা, বিয়ে হয়ে অবধি বাপের বাড়ী যায় নি! শ্বশুরের কাছে দুজনে নিত্য দিন বায়না জানায়,—একদিনের জন্য অন্ততঃ আমাদের অনুমতি দিন,—বাপের বাড়ী গিয়ে মা-বাপ ভাই-বোনদের দেখে আসি! বিয়ে দেছেন বলে' তাঁরা তো আর তাঁদের মেয়েদের জলে ভাসিয়ে ছান নি, সত্যি!

শ্বশুর ত্রিলোচন মনে-মনে ভাবেন, কথাটা সত্য! কিন্তু দুই বৌকে বাপের বাড়ী পাঠালে সংসার যে এদিকে অচল হবে! কে করবে রান্না? কে করবে বান্না? বড় দুই ছেলেকে নিত্য

কাজ-কর্ম্ম করতে বেরুতে হয়, ছোট যায় ইস্কুলে,—তাঁরো আছে রাজ-বাড়ীর চাকরি। কাজেই তিনি বলেন,—যেয়ো গো যেয়ো বাছারা। সামনের মাসে একটা ছুটীর দিন দেখে দুজনে বাপের বাড়ী ঘুরে সকলকে দেখে-শুনে এসো।

এমনি করে মাসের পর মাস যায়। কত সামনের মাস এগিয়ে এসে পিছনে কোথায় মিলিয়ে গেল, তবু দুই বৌ আর বাপের বাড়ী যেতে পায় না!

শেষে দু'জনে বললে—কালই আমরা বাপের বাড়ী যাবো। যদি যেতে না দেন, তাহলে দু'জনে একসঙ্গে আমরা নদীর জলে গিয়ে ডুব দেবো।

ত্রিলোচন প্রমাদ গণলেন! নদীর জলে দুই বৌ গিয়ে যদি ডুব দেয়, তাহলেই তো সর্ব্বনাশ! সংসার চলবে কি করে? তিনি বললেন,—বেশ, যাবে। কিন্তু সর্ত্ত আছে। যদি সে-সর্ত্ত পালন করতে পারো, তবেই যাওয়া হবে।

দুই বৌ বললে,—বলুন আপনার সর্ত্ত!

শ্বশুর ত্রিলোচন বললেন,—দুজনে বাপের বাড়ী যাবে শুধু-হাতে। কিন্তু আসবার সময় দুজনকে বাপের বাড়ী থেকে দু'টি জিনিষ আনতে হবে।

বৌয়েরা বললে,—কি জিনিষ, বলুন!

শ্বশুর বললেন—বড় বৌ নিয়ে আসবে কাগজের থলিতে ভরে' আলো! আর মেজ বৌ নিয়ে আসবে কাগজের থলিতে পুরে বাতাস! ছাখো, পারবে?

দুই বৌয়ের প্রাণ তখন বাপের বাড়ী যাবার জন্য আন্‌চান্‌ করছে! কোনো-কিছু না ভেবে তারা বলে বসলো—আনবো আমরা আপনার জিনিষ।

বড়বৌ বললে—আমি আনবো কাগজের বগলিতে ভরে আলো!

মেজ বৌ বললে—আমি আনবো কাগজের বগলিতে পূরে বাতাস!

দু'বৌয়ের কথা শুনে শ্বশুর ত্রিলোচন অবাক! বৌয়েরা বলে কি! তিনি বললেন—আর যদি না আনতে পারো?

বৌয়েরা বললে—বলুন তাহলে কি হবে?

শ্বশুর বললেন—না আনতে পারলে এ-বাড়ীতে তোমাদের আর ঢুকতে দেবো না! দু'বৌকে বনবাস দেবো।

দু'বৌ যাবার জন্য তখন পাগল! তারা বললে—বেশ! এ সর্ত্তে আমরা রাজী!

পরের দিন দুই বৌ পাল্কী করে বাপের বাড়ী গেল। দু'বাপের বাড়ীতে আনন্দের স্রোত উথলে উঠলো। মা-বাপ ভাই-বোন মহাখুশী। কি খাওয়াবেন, কি-রকম যত্ন-আদর করবেন, তাঁরা যেন একেবারে মেতে উঠলেন!

আমোদ-আহ্লাদে সারাদিন কাটলো, তারপর ফেরবার পালা। দুবৌয়ের মন ভয়ে ছম্‌ছম্‌ করতে লাগলো। শ্বশুরের সঙ্গে সর্ত্ত

করে এসেছে, বড় বৌকে নিয়ে যেতে হবে কাগজের বগলিতে ভরে আলো, আর মেজ বৌকে নিয়ে যেতে হবে কাগজের বগলিতে পুরে বাতাস! এমন কখনো নাকি হয়? কাগজে আলো জ্বাললে তখনি কাগজ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে! আর বাতাস? সে কি ধরবার জিনিষ যে কাগজে ভরবে!

দুজনের মুখ হলো মনিক। মা-বাপ ভাবলেন, শ্বশুর-বাড়ী চলেছে, তাই মুখ এমন .মলিন হয়েছে! তাঁরা বললেন—হাসি-মুখে শ্বশুর-বাড়ী যেতে হয় মা!

দু'বৌ বললে—হ্যাঁ।···কিন্তু বড্ড মন কেমন করছে কি-না, তাই এখন হাসতে পাচ্ছি না, বুক ভরে খালি কান্না উথলে উঠছে।

পাল্কী এলো। দুইবৌ দু'খানি পাল্কীতে চড়ে শ্বশুর-বাড়ী চললো।

পথে ছিল মস্ত মাঠ। মাঠের মাঝখানে পাল্কী থামিয়ে পাল্কী থেকে নেমে দুই বৌ কাঁদতে বসলো। বললে, সে-বাড়ীতে শ্বশুর যখন ঢুকতে দেবেনা, তখন মিথ্যা আর কেন সেখানে ফিরি? তার চেয়ে দু'জনে মিলে ঐ কালিন্দী নদীর জলে গিয়ে ডুব দি চলো! পাড়ার পাঁচ-জনের সামনে শ্বশুর যদি তাড়িয়ে দেন, তাতে বড্ড অপমান! সে অপমান সইতে পারবো না, ভাই!

দু'জনে কাঁদতে কাঁদতে মাঠ বয়ে কালিন্দীর দিকে চললো। পথে দেখা এক রূপসী কন্যার সঙ্গে। মেয়েটি গোরু চরিয়ে

গোরুর দড়ি ধরে বাড়ী ফিরছিল। দুই বৌয়ের চোখের জল আর খালি পাল্কী দু'খানা দেখে মেয়েটি বললে—পাল্কী থেকে নেমে কাঁদতে কাঁদতে দুজনে কোথায় চলেছো গা?

দুই বৌ বললে—কালিন্দী নদীর জলে আমরা ডুবে মরতে চলেছি বোন।

মেয়েটি বললে—কি দুঃখে মরবে, শুনি?

দুই বৌ তখন শ্বশুরের কথা খুলে বললে।

শুনে মেয়েটি বললে—এই কথা! এর জন্য মরতে হবে না। আমার সঙ্গে এসো, আমি দেবো কাগজের বগলিতে আলো আর বাতাস ভরে।

মেয়েটির কথা শুনে দুই বৌ অবাক! তারা ভাবলে, এ কি পাগল মেয়ে!

মেয়েটি হাসলো, হেসে বললে—এসো না আমার সঙ্গে। ও দু'টি জিনিষ যদি দিতে না পারি, তখন না হয় কালিন্দীর জলে গিয়ে ডুব দিয়ো। একটু দেরী হলে কালিন্দীর জল তো আর শুকিয়ে যাবে না!

দুই বৌকে নিয়ে মেয়েটি এলো তার বাড়ীতে। এসে বড় বৌয়ের জন্য কাগজ দিয়ে তৈরী করলে চমৎকার একটি ফানুশ। ফানুশ তৈরী করে তার মধ্যে বাতি বসিয়ে বাতি জ্বেলে দিলে; বললে—কাগজের বগলিতে আলো পেলে তো!

বড় বৌ খুশী হয়ে ফানুশ নিয়ে বললে—চমৎকার!

মেজ বৌ বললে—আমার বাতাসের বগলি?

মেয়েটি তখন কাগজ পাকিয়ে দিব্যি জাপানী হাত-পাখা তৈরী করে দিলে। পাখা যেমন খোলা যায়, তেমনি আবার মুড়ে বন্ধ করে রাখা যায়। খুলে কাগজের পাখায় যত-খুশী হাওয়া খাও।

বৌয়েরা দিলে ফানুশ আর হাত-পাখা

কাগজের পাখা হাতে নিয়ে মেজ বৌ বললে—তুমি ভেল্কি জানো বোন্!

পাল্‌কী চড়ে দুই বৌ শ্বশুর-বাড়ী ফিরলো।

শ্বশুর ত্রিলোচন ছিলেন বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে। দুই বৌকে ফিরতে দেখে বললেন—আগে সর্ত্ত-মতো তোমাদের জিনিষ দাও। তারপর বাড়ী ঢুকবে।

এ কথা শুনে বড় বৌ দিলে শ্বশুরের হাতে কাগজের ফানুশ, ফানুশের মধ্যে বাতি জ্বলছে। আর মেজ বৌ দিলে কাগজের মোড়া পাখা খুলে—তাতে বাতাস বইয়ে!

শ্বশুর অবাক! বললেন,—হুঁ! কার বুদ্ধিতে এ দু'টি জিনিষ হলো, বলো তো এখন?

দুই বৌ বললে—মাঠের ধারে গাঁয়ে থাকে একটি মেয়ে। সেই মেয়ে দেছে এ দু'টি জিনিষ।

শ্বশুর বললেন,—বটে! সে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে?

দুই বৌ বললে,—না।

শ্বশুর বললেন—বটে! তা হলে চলো তো আমাকে নিয়ে সেই মেয়ের কাছে। যে-মেয়ের এমন বুদ্ধি, তাকে দেখে এখনি আমি ছোট ছেলের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে' আসতে চাই!

দুই বৌকে নিয়ে শ্বশুর তখনি চললেন সেই বুদ্ধিমতী কন্যার কাছে। সে-কন্যা তখন খাওয়া-দাওয়ার জোগাড় করছে।

ত্রিলোচন বললেন—তোমার সঙ্গে আমার ছোট ছেলের বিয়ে দিয়ে বাড়ীর বৌ করবো মা-লক্ষ্মী—এমন তোমার বুদ্ধি!

মেয়ে বললে,—আচ্ছা।

বিয়ে হলো। বিয়ের পর মেয়েটি এ-বাড়ীতে এলো এ-বাড়ীর ছোট বৌ হয়ে।

শ্বশুর বললেন—ছোট হলে কি হবে, ওঁর যখন এমন বুদ্ধি, তখন সংসার ওঁর হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। ওঁর বুদ্ধিতে সংসার দুদিনে ফেঁপে উঠবে!

বড়বৌ মেজবৌ বললেন—খুব ভালো কথা! আমরা এতে রাজী।

তিন ছেলেকে ডেকে ত্রিলোচন বলে দিলেন,—যে যা করবে বাপু, ছোট বৌমার পরামর্শ নিয়ে করবে। তিনি যা বলবেন, সকলকে সে-কথা মেনে চলতে হবে। যে মানবে না, এ বাড়ীতে তার স্থান হবে না।

সকলেই বললে,— তথাস্তু।

ছোট বৌ তখন সকলকে বলে দিলেন—বাড়ী থেকে যখন কেউ বাইরে যাবেন, শুধু হাতে যাবেন না—ধানের বীজ, ফল-ফুলের বীজ নিয়ে বেরুবেন। নিজেদের যে-জমি আছে, বাগান আছে, সেই সব জমিতে-বাগানে সে-বীজ ছড়িয়ে দিয়ে যাবেন। আর বাড়ী ফেরবার সময় কেউ শুধু-হাতে ফিরবেন না—সামান্য যা-হোক কিছু ফলমূল হাতে নিয়ে বাড়ী ফিরবেন!

ত্রিলোচন বললেন,—এ-কথা অক্ষরে-অক্ষরে সকলকে মানতে হবে বাপু, বুঝলে !

তিন ছেলে বললে,—বুঝেছি। নিশ্চয় মানবো।

তাই হলো। এ-কথা মানার ফলে ত্রিলোচনের জমি ফশলে ভরে উঠলো। বাগানে ফুল-ফলের অন্ত নেই। ফুল-ফল বেচে অজস্র টাকা আসতে লাগলো।

সেদিন সকলে ফেরবার সময় বাড়ীতে ফসল বয়ে আনছে, ছোট বৌ বললে—এবার থেকে বাড়ী ফেরবার সময় পথের নুড়ি-পাথর কুড়িয়ে আনবেন, এনে আমাদের উঠোনে জড় করতে হবে।

তাই হলো। দেখতে দেখতে নানা রকমের নুড়ি-পাথর জমে বাড়ীর উঠোনে যেন পাহাড় গড়ে উঠলো !

একদিন কোথা থেকে এক বিদেশী সদাগর এসে ত্রিলোচনকে ধরে বসলো, বললে—এ-সব পাথর আমি কিনবো। কত দাম চাই ?

ত্রিলোচন বললেন—আমি কোনো কথা বলতে পারবো না মশাই। ছোট বৌমা যা বলবেন, তাই হবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

সদাগর বললে—আসুন জিজ্ঞাসা করে'।

নুড়ি-পাথর কিনতে সদাগর-খদ্দের এসেছে শুনে ছোট-বৌ

চমকে উঠলো। ভাবলে, তাহলে ও নুড়ি-পাথরের সঙ্গে দামী পাথর আছে নিশ্চয় !

ছোট-বৌ বললে—এ নুড়ি-পাথর বেচতে পারি,. যদি আপনি লাখ টাকা দাম দ্যান !

ত্রিলোচন বাইরে এসে বললেন—লাখ টাকা দাম দেবেন ?

সদাগর কি ভাবলো, ভেবে বললে—দেবো আমি লাখ টাকা ! লোকজন আর টাকা নিয়ে কাল আমি আসবো এই নুড়ি-পাথর নিতে ।

ত্রিলোচন এসে ছোট-বৌকে এ-খপর দিলেন।

ছোট-বৌয়ের মাথায় তখন মতলব খেলে গেল ! ছোট-বৌ বললে—তাহলে সদাগরকে নেমন্তন্ন করুন বাবা। এত টাকার খদ্দের—ওঁকে খাতির করা চাই তো ! বলে দিন, কাল এ বাড়ীতে এসে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। আমোদ-আহ্লাদ করবেন, করে' পরশু সকালে দাম দিয়ে গাড়ী ভরে' নুড়ি-পাথর তুলে নিয়ে যাবেন।

ত্রিলোচন এসে সদাগরকে বললেন—শুনচেন মশায়, কাল সন্ধ্যার সময় এখানে আপনার নেমন্তন্ন—ছোট বৌমা বলে দিলেন······

পরের দিন বাড়ীতে মস্ত ঘটার আয়োজন। পোলাও-

কালিয়া রান্না হচ্ছে···বাড়ী-ঘর ফুলে, পাতায়, কাগজের মালায় চমৎকার সাজানো হয়েছে···নাচ-গানের ব্যবস্থা হয়েছে !

সন্ধ্যার সময় সদাগর এলো। তার সঙ্গে এলো সদাগরের সরকার আর প্রায় একশোজন কুলি আর মস্ত দু'খানা গাড়ী।

ত্রিলোচন খাতির-যত্ন করে' সদাগরকে এনে বৈঠকখানায় বসালেন। তিন ছেলে সদাগরের অভ্যর্থনা সুরু করলে। বড় দিলে গোলাপ-পাশ ভরে গোলাপ-জল, মেজো দিলে তুলো-ভরা আতর, ছোট ছেলে দিলে পাণ-তামাক-চুরুট।

আনন্দে মত্ত হয়ে সদাগর তার সরকারকে বললে,—বুঝলে হে মুরারি, ও নুড়ি-পাথরের মধ্যে আছে দশখানা খুব দামী হীরে —তার একখানা বেচলে মেরে দেবো কম্‌-সে-কম্‌ দু' লাখ টাকা ! হুঁঃ !······

পাশের ঘরে ছোট-বৌ ছিল কাণ পেতে,—সদাগরের এ কথা ছোট-বৌ শুনলো। শুনে তখনি ঘর থেকে বেরিয়ে নুড়ি-পাথর ঘাঁটতে বসলো। সারা রাত নুড়ি-পাথর ঘেঁটে দশখানি দামী হীরে বেরুলো। ছোট-বৌ সে-হীরে রেখে দিলে নিজের কাছে—কাকেও এ-হীরের কথা বললে না।

পরের দিন সকালে ত্রিলোচনের হাতে লাখ টাকা দাম দিয়ে

কুলি-মজুর লাগিয়ে দু'ঘণ্টার মধ্যে সেই পাহাড়-প্রমাণ নুড়ি-পাথর তুলে গাড়ি বোঝাই করে' সদাগর চলে গেল।

পাল্কী চড়ে এলো জহুরী-বাজারে

সদাগর চলে গেলে ছোট-বৌ পাল্কী চড়ে একদিন চলে এলো জহুরী-বাজারে—হীরে দশখানি দেখালো জহুরীদের!

হীরে দেখে জহুরীদের চোখ ঠিকরে পড়বার জো!

ছোট-বৌ বললে—এ-হীরের কত দাম দেবেন, বলুন ত?

একজন জহুরীর সাধ্য নয়, দশখানি দামী হীরে কেনে!

দশজনে মিলে হীরে দশখানি কিনে ছোট বৌয়ের হাতে দাম দিল দশ-লাখ মোহর!

মোহর নিয়ে পাল্কী চড়ে ছোট-বৌ বাড়ী ফিরলো।

শ্বশুর বললেন—কোথায় গেছলে ছোট বৌমা?

দশ লাখ মোহর শ্বশুরের হাতে দিয়ে ছোট-বৌ বললে—ব্যাঙ্কে পাঠান আর মস্ত বাড়ী তৈরী করবার ব্যবস্থা করুন। রাজ-অট্টালিকা চাই।

ছ' মাসের মধ্যে রাজ-অট্টালিকা তৈরী হলো। রাজ্যশুদ্ধ লোক সে-অট্টালিকার শোভা দেখে হতভম্ব!

অট্টালিকার ফটকে শ্বেত-পাথরে ছোট-বৌ লিখে দিলেন—

এ বাড়ীতে দুঃখ নাই :

এখন এ-পথে একদিন চলেছিলেন রাজার সহর-কোতোয়াল!

ত্রিলোচনের বাড়ীর ফটকে "এ বাড়ীতে দুঃখ নাই" লেখা দেখে তাঁর চোখ কপালে উঠলো! এত বড় স্পর্দ্ধা—বাড়ীতে দুঃখ নেই—এ কথা লেখে! কে এ লোক?

এ লোককে তখনি তিনি ডাকিয়ে পাঠালেন।

ত্রিলোচন এলে কোতোয়াল বললেন,—এ কথা যে তুমি লিখেচো,—'এ-বাড়ীতে দুঃখ নাই,' এ-কথা সত্য ?

ত্রিলোচন বললেন—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

কোতোয়াল বললেন—এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা তুমি নিজে লিখেছো ?

ত্রিলোচন বললেন—আজ্ঞে না। আমার ছোট বৌমা লিখেছেন।

কোতোয়াল বললেন—যে লিখেছে, তাকে সাজা পেতে হবে —এই আস্পর্দ্ধার কথা লেখবার জন্য !···এ কথা লেখা থাকবে শুধু রাজ-বাড়ীতে। ডাকো তোমার ছোট বৌমাকে।

কোতোয়ালের হুকুম ! ত্রিলোচন কি করেন, ছোট বৌমাকে ডাকলেন।

ছোট-বৌ এলো।

কোতোয়াল বললেন—এ কথা লেখবার জন্য তোমাকে সাজা নিতে হবে।

—বলুন···কি সাজা ?

কোতোয়াল বললেন—এই যে প্রকাণ্ড রাজ-পথ—এ পথের মাপে তোমাকে কাপড় বুনে দিতে হবে রাজার জন্য। পারবে ?

ছোট-বৌ বললে—পথের মাপ দিন, নিশ্চয় কাপড় বুনে দেবো।

কোতোয়াল বললেন—হুঁ ! আর দিতে হবে তেল।···বুঝলে

বাছা! সর্ষের তেল। খাঁটী সর্ষে পিষে তেল—সুমুদ্দুরে যত জল আছে, এত তেল চাই।

ছোট-বৌ বললে—যে-সুমুদ্দুরের মাপে তেল চান, সেই সুমুদ্দুরের মাপটা দেবেন। সর্ষে এনে সেই সর্ষে পিষে আমি তেল তৈরী করে দেবো।

কোতোয়াল অবাক!…মেয়েটা মুখের উপর সমানে জবাব দিয়ে চলেছে! এ কে গো?

কোতোয়ালের হাতে ছিল পায়ে-শিকল-বাঁধা একটা চন্দনা পাখী। কোতোয়াল বললেন—তোমার তো খুব বুদ্ধি! আচ্ছা, বলো দিকিনি, এ পাখীটাকে আমি মেরে ফেলবো? না, উড়িয়ে দেবো?

ছোট-বৌ তখন নিজের এক-পা ফটকের বাইরে, আর-এক-পা বাড়ীর ভিতরে রেখে বললে—আপনি যদি বলতে পারেন, আমি বাড়ীর মধ্যে যাবো? না, ফটকের বাইরে দাঁড়াবো? তাহলে আমি আপনার পাখীর কথার জবাব দেবো।

কোতোয়াল এ-কথার জবাব দিতে পারলেন না।

ছোট-বৌয়ের কথা শুনে তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে, কোতোয়াল বললেন,—বাঃ! খাশা মেয়ে তুমি! চমৎকার তোমার বুদ্ধি! না, তোমার সাজা হবে না। মহারাজের কাছে তোমার বুদ্ধির কথা বলবো গিয়ে,—শুনে মহারাজ খুশী হয়ে তোমাকে পুরস্কার দেবেন!

চন্দ্রলেখা

ছোট-খাট রাজ্য। সে-রাজ্যে এক গরীব ব্রাহ্মণের বাস। ব্রাহ্মণের একটী কন্যা। কন্যার নাম চন্দ্রলেখা। চন্দ্রলেখা পরমা-সুন্দরী!

ব্রাহ্মণ নানা জায়গায় যান, দেখেন, পরের বাড়ীর মেয়েরা দিব্যি পাঠশালায় যাচ্ছে; লেখাপড়া শিখছে। তাঁর ইচ্ছা হলো, চন্দ্রলেখাও ওদের মতো পাঠশালায় যায়; গিয়ে ওদের মতো লেখাপড়া শেখে! কিন্তু ব্রাহ্মণের পয়সা কোথায় যে পাঠশালার মাহিনা দেবেন?

একদিন রাজার পাঠশালার গুরুমশায়ের সঙ্গে দেখা করে ব্রাহ্মণ বললেন,—আমার মেয়েটি লেখাপড়া শেখে, আমার বড় সাধ পণ্ডিত মশাই, কিন্তু পাঠশালার মাইনে দেবো, এমন সঙ্গতি আমার নেই!

পণ্ডিত মশাই বললেন—তোমার মেয়েকে এনো। যদি দেখি, তার বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে, তাহলে সে বিনা-মাইনেয় পড়তে পাবে।

ব্রাহ্মণ চন্দ্রলেখাকে নিয়ে পাঠশালায় এলেন। মেয়েটিকে দেখে গুরুমশায় বুঝলেন, মেয়েটি বুদ্ধিমতী। বিনা-মাইনেয় চন্দ্রলেখাকে তিনি পাঠশালায় ভর্ত্তি করে নিলেন।

চন্দ্রলেখা নিত্য পাঠশালায় যায়। তার খুব বুদ্ধি। অন্য মেয়েরা পাঁচ দিনে যা শেখে, চন্দ্রলেখা তা শেখে একদিনে।

পাঁচ বছরে পাঠশালার সব পাঠ শিখে চন্দ্রলেখা গুরু-গৃহ থেকে বিদায় নেবার সময় গুরুমশায়ের পায়ের কাছে প্রণাম করে সরায় ভরে ছুটি আলো-চাল, সেই সরায় একটি পাণ, একটি সুপুরি, একটি পৈতে, আর একটি টাকা রেখে বললে,—দক্ষিণা নিয়ে আমায় বিদায় দিন, গুরুমশায়।

গুরুমশায় বললেন—এ দক্ষিণায় হবে না বাপু!

চন্দ্রলেখা বললে—এর বেশী দেবার সঙ্গতি তো আমার বাবার নেই।

গুরুমশায় বললেন—দক্ষিণার মতো দক্ষিণা দেবার সঙ্গতি তোমার বাবার আছে—আমি জানি। পান-সুপুরির ফাঁকিতে আমি ভুলছি না!

চন্দ্রলেখা বললে—বলুন, আপনি কি দক্ষিণা চান? আমার বাবাকে গিয়ে আমি বলবো।

গুরুমশায় বললেন—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে বলো তোমার বাবাকে। তবেই দক্ষিণা দেওয়া হবে।

এ কথা শুনে চন্দ্রলেখা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। এক-নিমেষ আর সেখানে দাঁড়ালো না; বাড়ী চলে এলো।

মলিন মুখ,—মেয়ে হাসে না, কারো সঙ্গে কথা কয় না।

যেন কেমন হয়ে গেছে! মা বলেন,—মেয়ের কি হলো? লেখাপড়া শেষ করে বিদ্যা শিখে বাড়ী ফিরে এলো—মেয়ে যেন পাথরের পুতুল!

বাপ বললেন—তাইতো, তোমার কি হয়েছে চন্দ্রলেখা?

চন্দ্রলেখা কথা কয় না!

পাড়া-পড়সীরা এসে বললে—ভূতে পেয়েছে গো। বেশী লেখাপড়া শিখলে ছেলে-মেয়েদের প্রথম-প্রথম ভূতে পায়! তুমি রোজা ডাকো চন্দরের মা। না হলে মেয়ে চির-জন্ম বোবা পুতুল হয়ে থাকবে!

পাড়া-পড়সীর পরামর্শে রোজা এলো। অনেক মন্তর পড়লো, অনেক যাগযজ্ঞ হলো। মেয়ে কিছুতেই কথা কয় না! কিন্তু নিশ্বাস ফেলে রোজা বললে,—বুঝেছি ঠাকুর, এ একেবারে গুরু-ভূত! এ-ভূত ছাড়বে একটি কাজ করলে!

ব্রাহ্মণ বললেন—কি কাজ?

রোজা বললে—অমাবস্যার রাত্রে একলা-কন্যাকে-একশো আট জবা-ফুল নিয়ে শ্মশানে গিয়ে মা-শ্মশান-কালীর পূজো করবে। কেউ তাঁর সঙ্গে যাবে না!

ব্রাহ্মণী বললেন—পূজোর মন্তোর?

রোজা বললে—শুধু দুটি কথা…ঔং ক্লীং! বাস্! চোখ বুজে শ্মশানে বসে সারা রাত এই দুটি মন্ত্র আওড়াতে হবে, আর মাঝে-মাঝে নিজের মাথায় একটি করে জবা ফুল দিতে হবে। …একশো-আটটি জবা-ফুল চাই। ভোর হলে তবে পূজো

শেষ। তারপর কন্যা ঘরে আসবেন, আমি জল-পড়া খেতে দেবো। তখন যেমন কন্যা, তেমনি হবেন।

সেই ব্যবস্থাই হলো। অমাবস্যার রাত্রে চন্দ্রলেখা শ্মশানে চললো।

আর সকলে ভয়ে কাঁটা! চন্দ্রলেখার মনে ভয় নেই! সে তো জানে, তাকে ভূতে পায়নি! কিন্তু লজ্জায় গুরুর কথা কাকেও বলতে পারছে না! বেচারী কি করে? যে যা বলে, দায়ে পড়ে তাই শুনছে!

শ্মশানে এসে পূজো সুরু করতে তার বয়ে গেছে! শ্মশানে বসে সে ভাবতে লাগলো—লেখাপড়া তো আমি শিখলুম······এর পর কি করবো?

এখন সেই শ্মশানে ছিল ডাকাতদের আস্তানা। ডাকাতদের দলে আছে তারা আটজন। শ্মশানে মস্ত বটগাছের পিছনে এক গভীর গুহা। সেই গুহায় তারা চোরাই-মালপত্র এনে জমা করে।

সে-রাত্রে ডাকাতরা আটটা ভারী ভারী বাক্স মাথায় করে এসে হাজির। তাদের পায়ের শব্দ শুনে ভয় পেয়ে চন্দ্রলেখা গিয়ে আশ্রয় নিলে সেই বটগাছের পিছনে।

দীপের আলোয় দেখে বড়-বড় সব কাঠের বাক্স।

ডাকাতরা এলো। এসে নিঃশব্দে গুহায় নেমে আটটা বাক্স সেখানে রেখে আবার চলে গেল।

তারা চলে গেলে চন্দ্রলেখা পা টিপে-টিপে গুহায় নাম্‌লো। নেমে দেখে, গুহায় কতকগুলো দীপ জ্বলছে! দীপের আলোয় দেখে, বড়-বড় সব কাঠের বাক্স। অনেকগুলো বাক্স! বাক্সয় চাবি-দেওয়া নেই।

চন্দ্রলেখা বাক্স খুললো। খুলে দেখে, বাক্স একেবারে গহনায় ভর্ত্তি। সেই সব গহনা বার করে আঁচলে বেঁধে চন্দ্রলেখা শ্মশানে বসে রইলো। তারপর রাত পোহালে লোক-জন ওঠবার আগে সে ফিরলো তার নিজের বাড়ী।

বাপ-মা তখনো ওঠেননি! গহনাগুলো তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে মাটীর নীচে পুঁতে রেখে চন্দ্রলেখা মুখ-হাত ধুয়ে দাওয়ায় এসে বসলো।......

পরের দিন রাত্রে ডাকাতের দল গুহায় এসে দেখে, বাক্স খালি!

সর্ব্বনাশ! কে এ-সবের সন্ধান পেলে?

সন্ধান করতে করতে দেখে, বাক্সয় রক্তর দাগ। বুঝলো, বাক্স যে লুঠ করেছে, এ তার রক্ত, নিশ্চয়!

ভেবে তখন তারা বুদ্ধি বার করলে। একজন ডাকাত মলমের কৌটো নিয়ে দিনের বেলায় গ্রামে বেরুলো। পথে পথে সে হাঁকতে লাগলো,—মলম চাই! কাটা ঘায়ের ভালো মলম! কাটা-ঘা এ-মলমে বেমালুম জুড়ে যাবে! চাই, কাটা ঘায়ের মলম চাই!

এখন ব্রাহ্মণী দেখেছেন, কাল রাত্রে শ্মশান থেকে চন্দ্রলেখা পা কেটে বাড়ী এসেছে। তিনি মলম-ওলাকে ডাকলেন।

মলমওলা এলো।

ব্রাহ্মণী বললেন—কাল শ্মশান থেকে মেয়ে পা কেটে এসেছে। দিতে পারো তার মলম ?

ডাকাত চমকে উঠলো। তবে তো সন্ধান মিলেছে! ডাকাত বললে,—সে মেয়ে ? না, পুরুষ ?

ব্রাহ্মণী বললেন,—মেয়ে! আমার মেয়ে।/

ঘর থাকতে বললে এই নাও বাছা মলম !

মলম দিয়ে নিশানা পেয়ে ডাকাত খুশী হয়ে চলে এলো।

ব্রাহ্মণী মেয়ের পায়ে মলম লাগিয়ে দিলেন।

রাত্রে চন্দ্রলেখার গা যেন কাঁটা! ডাকাতরা কি চুপ করে থাকবে ? সন্ধান করবে না ?

কিছুতে আর তার ঘুম আসে না! হঠাৎ শুনলো, দেওয়ালে শাবলের ঘা পড়ছে। চোখ বুজে আড়ষ্ট-কাঠ হয়ে সে বিছানায় পড়ে রইলো।

সিঁধ দিয়ে ঘরে ঢুকলো আটজন ডাকাত। ঘরে ঢুকে দেখলে, মেয়ে ঘুমোচ্ছে, তার ডান পায়ে মলম।

এ-ই তবে চোরের উপর বাটপাড়ি করে এসেছে! বটে!

খাশা রূপসী মেয়ে! ডাকাতরা বললে,—একে চুরি করে নিয়ে যাই, চ। বিয়ে করবো। বিয়ে করলে ডাকাতি করে রোজ রোজ ঘরে ফিরে আর রাঁধতে হবে না।

খাটিয়া-শুদ্ধ চন্দ্রলেখাকে মাথায় করে আট-ডাকাত ফিরলো জঙ্গলে। চন্দ্রলেখা খাটিয়ায় কাঠ হয়ে পড়ে আছে।

জঙ্গলে খাটিয়া নামিয়ে ডাকাতরা মহা-খুশী! বললে,—এবারে রান্নাবান্নার জোগাড় দেখি, আয়।······

ঝোপের ওপাশে গভীর জঙ্গল। এ জঙ্গল থেকে বেরুনো—এ কি পুঁচকে মেয়ের কাজ!···নিশ্চিন্ত হয়ে ডাকাতরা চললো খাবারের সন্ধানে।

চন্দ্রলেখা যখন বুঝলো, তারা অনেক-দূরে চলে গেছে, তখন সে উঠে বসলো। উঃ, অজগর জঙ্গল! সে গ্রামের পথ জানে না—বাড়ী ফেরবার উপায়?

অথচ নিরুপায় হয়ে এখানে থাকলেও তো চলবে না। উপায় করতেই হবে এবং সে-উপায়, এই জঙ্গল ফুঁড়ে পালানো।

খাটিয়ার কাছে পড়েছিল মস্ত একখানা ছোরা। ছোরা-খানা বুকের কাপড়ে লুকিয়ে চন্দ্রলেখা জঙ্গলের পথে চললো—যেদিকে ডাকাতরা গেছে, ঠিক তার উল্টো দিকে।

চলে' চলে' কত জঙ্গল যে পার হলো! তবু জঙ্গল আর শেষ হয় না! রাত জাগা, ভয়, ক্লান্তি—এ-সবের ভারে চন্দ্রলেখার শেষে এমন হলো যে পা আর চলে না! পা দুটিকে ঠেলে ঠেলে তবু সে চলে···চলে········

পিছনে হঠাৎ মানুষের গলার স্বর। চন্দ্রলেখার গায়ে কাঁটা

দিলে! ঝোপ-ঝাপ এমন যে নজর চলে না। কাকেও সে চোখে দেখতে পেলে না!

তবে স্বরে বুঝলে, সেই ডাকাতদের 'গলা'! তারাই কথা বলছে। তাদের কথা চলেছিল—

১। একরত্তি মেয়ে কোথায় পালিয়েছে?

২। কাছেই কোথাও আছে। সারা জঙ্গল পাতি-পাতি করে খোঁজ্!

৩। পাহাড়ে মেয়ে!

৪। মেয়ে নয় তো, বাঘের ঘরে ঘোগ! আমরা লুঠপাট করে' গয়না-গাঁটি আনি। আমাদের সে-গয়নাগাঁটি ও করবে লুঠ!

৫। ও-মেয়েকে আস্ত রাখা নয়!

৬। নিশ্চয়!

সর্ব্বনাশ! চন্দ্রলেখার গা ছমছম করতে লাগলো। ওরা কথা কইছে—বেশী দূরে নয়। যদি তাকে দেখে ফেলে?

সে আর চলতে পারে না! চলবার শক্তি নেই! সামনে একটা ঘন ঝোপ। চন্দ্রলেখা সেই ঝোপের মধ্যে বসে রইলো!...

বেলা তখন দুপুর। আট ডাকাত আট-দিকে চন্দ্রলেখাকে খুঁজছে। খুঁজতে খুঁজতে একটা ডাকাত এলো একেবারে সেই ঝোপে চন্দ্রলেখার সামনে! দুজনে চোখোচোখি। চন্দ্রলেখার

বুকখানা ধড়াশ্ করে উঠলো। কিন্তু ভয় করলে চলবে না! সাহস চাই—সাহস!

ডাকাত বললে—তবে রে মেয়ের নিকুচি করেছে! সারা জঙ্গল আমাদের ঘোড়দৌড় করিয়েছো!

চন্দ্রলেখা বললে,—চুপ!

ডাকাত অবাক! বললে,—কেন? চুপ করবো কেন?

চন্দ্রলেখা বললে,—কথা আছে।

—কি কথা?

চন্দ্রলেখা বললে,—আমাকে বিয়ে করবে বলে এই বনে আমাকে এনেছো তো! তোমরা পুরুষ-মানুষ—নিজেরা রাঁধো-বাড়ো—একটা বৌ বিয়ে করলে সুবিধে হয়, বুঝি! তা আমি আটজনকে বিয়ে করবো না। স্বয়ং যে দ্রৌপদী—তিনিও বিয়ে করেছিলেন পঞ্চ-পাণ্ডবকে। অষ্ট-পাণ্ডবের কথা পুরাণে নেই। তাই আমি বলি কি, আমি শুধু তোমাকে বিয়ে করবো। কি বলো?

খুশী হয়ে ডাকাত বললে—বেশ!......

চন্দ্রলেখা বললে—তাহলে চুপি-চুপি তার আয়োজন করতে হবে।

এমন রূপসী কন্যা—তাকে বিয়ে করতে চাইছে! ডাকাত মহা-খুশী হয়ে এগিয়ে এলো।

যেমন হাতের নাগালে আসা, অমনি ঘ্যাঁচ্ করে চন্দ্রলেখা ছোরা বসিয়ে দিলে ডাকাতের নাকে। ছোরা লাগবামাত্র নাকটি বেমালুম

একেবারে কুচ্! নাকের জ্বালায় ডাকাত সেইখানে পড়ে ছটফট করতে লাগলো। তার চীৎকারে বনের শেয়ালগুলো ভয় পেয়ে হুক্কা-হুয়া হুক্কা-হুয়া রবে এমন চ্যাঁচানি ধরলে যে কাণ পাতা দায়!

সে গোলমালে চন্দ্রলেখা ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল দিয়ে সরে পড়লো। ভাগ্য ছিল প্রসন্ন। চন্দ্রলেখা গ্রামে এলো। তারপর নিজের বাড়ী।

মেয়ে পেয়ে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী মহা-খুশী!

চন্দ্রলেখা বললে,—খুশী হচ্ছো কি! যে কাণ্ড হয়েছে—বিলক্ষণ ভয় আছে!

ব্রাহ্মণ বললেন—কিসের ভয় রে?

চন্দ্রলেখা বললে,—পরে বলবো। এখন খুব সাবধান! রাজার কাছে এখনি নালিশ জানিয়ে এসো বাবা। বলবে, একটা সেপাই চাই। ডাকাত-শত্রু!

ব্রাহ্মণ-মানুষ রাজদ্বারে গিয়ে মিনতি জানাতে রাজা সেপাই দিলেন। ইয়া জোয়ান সেপাই—এ্যায়সা তার গালপাট্টা! ..আর হাতে যে-অস্ত্র···দেখলে চমকে উঠতে হয়!

সাত ডাকাত বার-বার ব্রাহ্মণের বাড়ীর কাছে আসে·—

মুখ চূর্ণ করে চলে যায়! রাজার হাতিয়ার পাহারা দিচ্ছে···টুঁ শব্দ করলে দল্‌কে-দলশুদ্ধ এখনি গ্রেফতার করবে!

তখন তারা এক বুদ্ধি বার করলে!

একজন ডাকাত এলো ব্রাহ্মণের ছদ্ম-বেশে; এসে বললে—মা শ্মশান-কালীর পূজা হবে সামনের অমাবস্যা-রাত্রে। মায়ের স্বপ্ন হয়েছে, তোমার ঘরে আছে চন্দ্রলেখা কন্যা—তাকে গিয়ে বনে মায়ের নাম-গান করতে হবে।

ব্রাহ্মণ মহা-খুশী। মেয়ের উপর মা-কালীর এমন অনুগ্রহ!

মেয়ে চন্দ্রলেখা বললে,—বেশ, আমি যাবো, যখন মায়ের আদেশ! কিন্তু আমার সঙ্গে ষোলজন যন্ত্রী যাবে। তারা ষোল রকম বাদ্য বাজাবে।

ব্রাহ্মণবেশী ডাকাত বললে,—বেশ!

অমাবস্যার দিন সকালে চন্দ্রলেখা নিজে রাজপুরীতে চললো। বৃদ্ধ রাজা সভায় বসে আছেন। চন্দ্রলেখা এসে রাজার পায়ে পড়ে নিবেদন জানালে,—বিপদে পড়েছি মহারাজ! ব্রাহ্মণ-কন্যা আমি···আপনার সাহায্য চাই।

মেয়েটিকে দেখে রাজার মনে মমতা হলো। তিনি বললেন—কি হয়েছে মা, বলো······

চন্দ্রলেখা বললে,—গোপনে বলবো, মহারাজ······

তাই হলো। সভাসদরা সভা ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। চন্দ্রলেখা তখন গুরু-মশায়ের দক্ষিণা চাওয়া থেকে সুরু করে সব কথা রাজার কাছে খুলে বললে।

শুনে রাজা বললেন,—হুঁ ! তোমার এমন সাহস, মা !·· ডাকাতের সঙ্গে সমানে টক্কর দেছ ! আমার কাছে আগে কোনো দিন নালিশ জানাও নি ! বেশ, আমি সাহায্য করবো··· তুমি যেমন বলবে।

চন্দ্রলেখা বললে—অমাবস্যার দিন জঙ্গলের ধারে আপনার সমস্ত সেনা যেন মজুত থাকে মহারাজ। জঙ্গলে শঙ্খধ্বনি হবামাত্র তারা যাবে। ডাকাতের দল তখনি গ্রেফতার হবে।

অমাবস্যার রাত্রে ষোলজন যন্ত্রী নিয়ে চন্দ্রলেখা চললো জঙ্গলের কালী-মন্দিরে। যন্ত্রীরা জনে-জনে মস্ত পালোয়ান। তাদের হাতে রইলো বাদ্যযন্ত্রের-বাক্সে ধারালো অস্ত্র-শস্ত্র।

আট ডাকাত মস্ত দল জড়ো করেছে। ওদের দলে আট-দশে আশী-জন লোক। চন্দ্রলেখা বললে—বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে শঙ্খধ্বনি করে মাকে ডাকবো। তোমরা সকলে চোখ বুজে মায়ের রূপ ধ্যান করো।

ডাকাতের দল তখনি চোখ বুজলো।

চন্দ্রলেখা শঙ্খধ্বনি করলে—বার-বার আটবার শঙ্খধ্বনি !

চকিতে অট্টরবে চারিদিক কাঁপিয়ে তীরের গতিতে ঘোড়ায় চড়ে সশস্ত্র রাজ-সৈন্যেরা এসে হাজির। ডাকাতরা ফন্দী করেছিল, গান জমলে চন্দ্রলেখাকে বন্দী করবে। তারপর তাকে শাস্তি যা দেবে, ভয়ঙ্কর !

হঠাৎ রাজসৈন্যেরা এসে হাজির। ডাকাতরা এর জন্ত তৈরী না। কাজেই·········

ডাকাতের দল বন্দী হলো। তারপর······

রাজা খুশী হয়ে পরের দিন ভোরে চন্দ্রলেখার বাড়ীতে এলেন। এসে ব্রাহ্মণকে বললেন,—একটা ভিক্ষা আছে, ঠাকুর।

ব্রাহ্মণ অবাক! ভাবলেন, তিনি স্বপ্ন দেখছেন বুঝি!

রাজা বললেন—আপনার এই বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী কন্যা চন্দ্রলেখাকে আমি ভিক্ষা চাই। যুবরাজের সঙ্গে এর বিয়ে দেবো। এমন বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী মেয়েই রাণী হয়ে সিংহাসনে বসবার যোগ্য। কোনো দিন মোগল-পাঠান যদি রাজ্য আক্রমণ করতে আসে, তাহলে রাণী চন্দ্রলেখার বুদ্ধিতে পরাস্ত হবে।

ব্রাহ্মণের দু'চোখে জলধারা! ব্রাহ্মণ ডাকলেন,—ব্রাহ্মণী···

ব্রাহ্মণী এলেন। শুনে বললেন,—এমন ভাগ্য আমার চন্দ্রলেখার! মহারাজ তাকে আদর করে বধূ করবেন!

রাজা বললেন,—বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী মেয়ের আদর হবে না তো কার আদর হবে? নির্গুণ রূপসী মেয়ের—যার [illegible] মাকাল-ফলের এতটুকু তফাৎ নেই?